সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

ফেব্রুয়ারি ২০২২

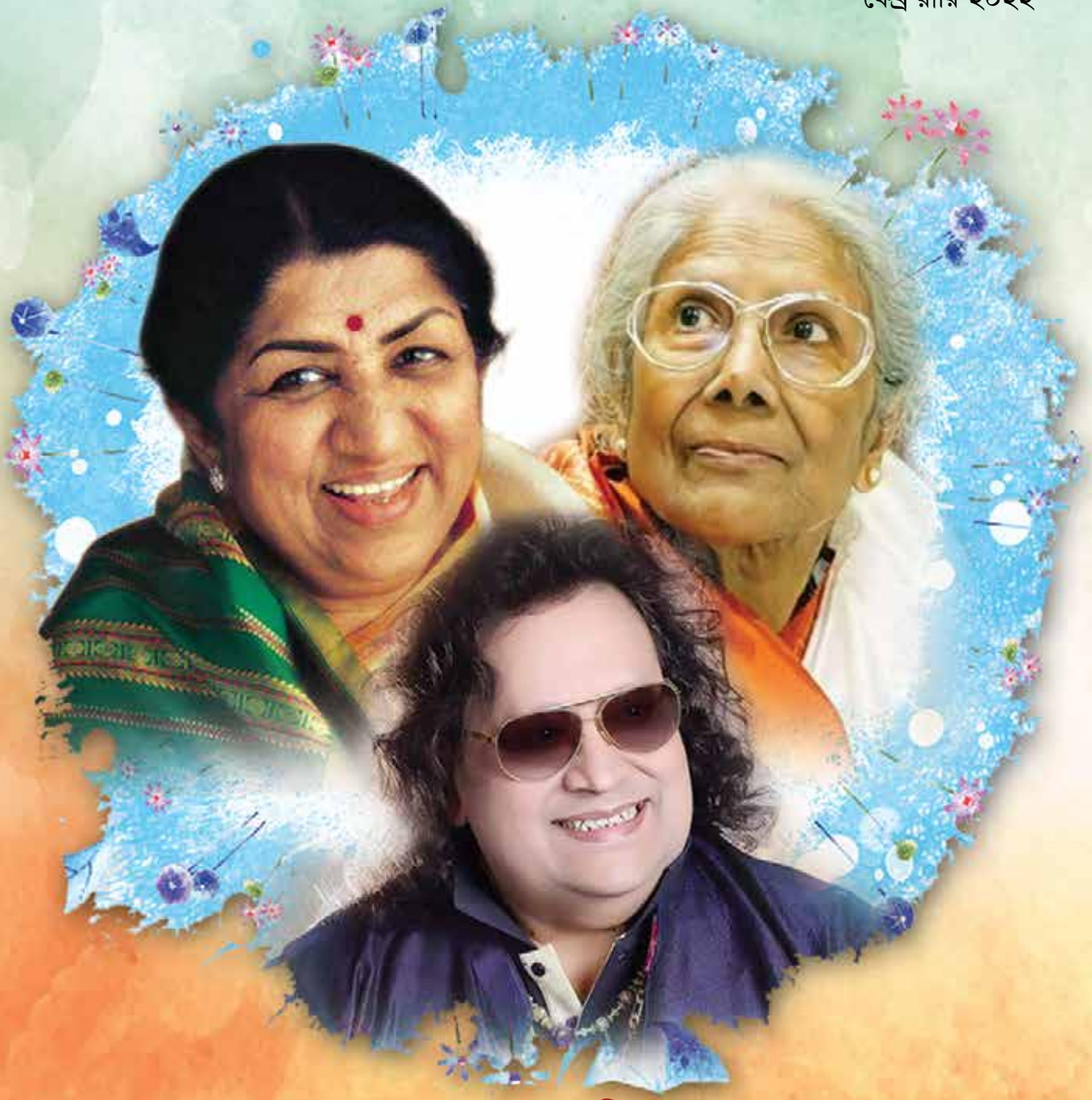

শ্রদ্ধাঞ্জলি

লতা মঙ্গেশকর ॥ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

বাপ্পি লাহিড়ি

বসন্ত পঞ্চমী

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বসন্তের আগমনে রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী দীপু মণির সঙ্গে হাই কমিশনার শ্রী বিক্রম দোরাইস্বামী

রেলমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ হাই কমিশনার শ্রী বিক্রম দোরাইস্বামী বাংলাদেশের রেলমন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম সুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে রেলখাতে চলমান সহযোগিতা ও এ থেকে ভবিষ্যতে সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে আলোচনা করেন

এমভি লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর যাত্রাপথের উদ্বোধন

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বন্দর, জাহাজ ও জলপথমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযুষ গয়াল বাংলাদেশের জাহাজ চলাচলমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদের সঙ্গে ২০০ মেট্রিক টন খাদ্য খাদ্যপণ্যবাহী এমভি লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর আইবিপি রুটে ২৩৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রাপথের উদ্বোধন করেন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৫০ | সংখ্যা ০২ | মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৮ | ফেব্রুয়ারি ২০২২

High Commission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

সম্পাদক
নান্টু রায়
ফোন: ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: inf4.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা

ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত
লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই।
এ পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

০৬-২৩ | শ্রদ্ধাঞ্জলি

সংগীতসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের মহাপ্রয়াণ

কথাটা কবি ও গীতিকার জাভেদ আখতারের। লতা মঙ্গেশকরকে নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'যদি বিশ্বের সব সুগন্ধি, সব চাঁদের আলো আর সমস্ত মধু একসঙ্গে করা হয়, তারপরও তা লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠের মত কিছু তৈরি হবে না।' আর মান্না দে বলেছিলেন, 'লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে ঈশ্বর বাস করেন।' আদর করে তাঁকে সুরের জীবন্ত সরস্বতী বলা হত। আর সরস্বতীর পূজার পরের দিনই চলে গেলেন সংগীতের এই মহাতারকা।

চিরকালের স্মৃতি ॥ ০৯-১০

অসাধারণ যে লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠ আমার মত কোটি কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে, নিশ্চয়ই এখন তিনি যেখানে আছেন, শান্তিতেই আছেন। লতাজির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হওয়ার মুহূর্তটি এখনও আমার কাছে জ্বলজ্বলে। ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার ফর রিলেশনস-এর আমন্ত্রণে আমি ভারতে যাই। সেখানে তিনটি অনুষ্ঠান করেছিলাম। সে সময় আয়োজকেরা আমার কাছে জানতে চান, এমন কেউ কি এখানে আছেন, যাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই? আমি বললাম লতাজির কথা। রুনা লায়লার স্মৃতিচারণ...

'ওঁকে অনুসরণ করেই বড় হয়েছি' ॥ ১০

লতা মঙ্গেশকরকে কবে থেকে চিনি? সেই কোন ছোট্টবেলা থেকে। ওঁর গান ঠোঁটস্থ। কেউ গাইতে বললেই গেয়ে উঠতাম, 'আয়েগা আনেওয়ালা।' ধীরে ধীরে লতা মঙ্গেশকর যেন আমার মধ্যে আত্মস্থ হয়েছেন। আমি এবং আমার সময়ের বাকি গায়িকারা ওঁকে অনুসরণ করেই বড় হয়েছি। বললেন হৈমন্তী শুক্লা...

সংগীতের ধ্রুবতারা

রেকর্ডিংয়ে তাঁর কতক্ষণ সময় লাগবে, তা ব্রহ্মাণ্ডের কারও জানা ছিল না। এমনও ঘটেছে, সকাল ন'টায় স্টুডিয়োয় ঢুকে পরের দিন ভোর পর্যন্ত ব্যস্ত থেকেছেন, ব্যস্ত রেখেছেন প্রায় দেড়শো যন্ত্রী ও পঞ্চাশজন সহকণ্ঠশিল্পীকে। কারণ, নিজের গাওয়া তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। কী সেই গান? 'ঘর আয়া মেরা পরদেশি'। তাঁকে দিয়ে গাওয়ানোর আগে সুরকারেরা লতার এই নাছোড় মনোভাবের কথা মাথায় রাখতেন।

লতা মঙ্গেশকর: ১০টি অজানা তথ্য

হাসপাতালে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর চলে গেলেন উপমহাদেশের সংগীতের প্রবীণ মহাতারকা লতা মঙ্গেশকর। চলুন জেনে নিই তাঁর কর্মবহুল জীবনের অজানা ১০টি তথ্য...

১. 'নাইটিঙ্গেল অফ ইন্ডিয়া' বলে আখ্যা পাওয়া লতা মঙ্গেশকর অর্ধশত বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে আঞ্চলিক, দেশি-বিদেশি মিলিয়ে গেয়েছেন ৩৬টি ভাষায় প্রায় ৩০ হাজার গান। ১ হাজারের বেশি সিনেমায় রয়েছে তার দেওয়া কণ্ঠ। মাতৃভাষার পর তিনি সবচেয়ে বেশি গান গেয়েছেন বাংলা ভাষায়।

'গানে প্রাণ পাচ্ছি না'

রাজনৈতিক গানটি গাইছেন লতা মঙ্গেশকর। একের পর এক টেক দিচ্ছেন, কিন্তু চলচ্চিত্র পরিচালকের আর কিছুতেই পছন্দ হয় না। তাঁর বক্তব্য, 'গানে প্রাণ পাচ্ছি না।' সুরকারও পড়েছেন অস্বস্তিতে, এতবার 'টেক' করতে হলে বিরক্ত হয়ে লতাজি চলে যাবেন না তো? কিন্তু লতা মঙ্গেশকর পূর্ণ সহযোগিতা করলেন। বললেন, যতক্ষণ পরিচালকের না পছন্দ হচ্ছে, তিনি গেয়ে যাবেন। শেষ পর্যন্ত একুশতম 'টেক'-এ মিলল সবুজ সঙ্কেত।

গানটি লতা ধরলেন না, মাথা নিচু করে বসে, মুখ যখন তুললেন তাঁর চোখে জল

রিহার্সালের শেষ প্রান্তে যখন 'রাতোঁ কি শায়র' গানটি শুরু হল, দেখলাম একটা ইন্টারল্যুড মিউজিকের পর আচমকা সব স্তব্ধ হয়ে গেল। কোনও এক অনিবার্য নৈঃশব্দ্য ঘিরে ধরল বিদ্যুৎ তরঙ্গিনীকে। গানটি লতা ধরলেন না। মাথা নিচু করে বসে আছেন শিল্পী। একটু দূরে সলিলদা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কিছু একটা কথা বলছেন। আমরা সবাই অবাক। একটু পরে যখন মুখ তুলে চাইলেন, খেয়াল করলাম তাঁর চোখে জল।

'বড্ড সরু গলা' ॥ ১৮-১৯

বিনায়ক দামোদর কর্নাটকির মৃত্যুর পর গুলাম হায়দার লতার দায়িত্ব নেন। তিনি লতাকে আলাপ করিয়ে দেন প্রযোজক শশধর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শশধর মুখোপাধ্যায় লতার গলার স্বর শুনে বলেছিলেন, 'বড্ড সরু গলা'। কিন্তু হায়দার জানতেন, এমন একদিন আসবে যখন সবাই এই লতার পায়ে পড়ে থাকবে গান রেকর্ডিং এর জন্য।

লতা মঙ্গেশকর: আমি বাংলায় গান গাই ॥ ২০-২১

ভারতের পশ্চিম উপকূলের মহারাষ্ট্রের মারাঠি মেয়েটি শুধু সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া নয়, তাবৎ পৃথিবী মাতিয়েছেন কিন্নরকণ্ঠের মোহনীয় মায়াজালের সুরেলা জাদুতে। লতা আর তার বোন আশার গানের তরঙ্গ তাদের জন্মস্থানের সুদূরবর্তী বাংলার ঘরে ঘরেও সমাদৃত। বাঙালি না হয়েও যেমন বাংলায় গান গেয়ে জনপ্রিয় হয়েছেন সুরসম্রাট মোহাম্মদ রফি, সুমন কল্যাণপুর, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, অলকা ইয়াগনিক, সাধনা সারগম এবং আরও বহু শিল্পী, তেমনই দৃষ্টান্ত রয়েছে সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের...

২২-২৩ | সাক্ষাৎকার

‘একটি জীবনই যথেষ্ট’

সাংবাদিক খালিদ মোহাম্মদের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনের নানা অজানা দিক খোলাখুলিভাবে তুলে ধরেন লতা। দুই বছর আগে এ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন খালিদ, ল্যান্ডফোনে দুই পর্বে। সেই সাক্ষাৎকারে পরজন্ম বা জন্মান্তর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি। তবু একবার চলে গেলে আমি সত্যিই আবার জন্ম নিতে চাই না। স্রষ্টা আমাকে পুনর্জন্ম না দিলেই ভাল। একটি জীবনই যথেষ্ট।’

২৪-২৫ | কবিতা

খোরশেদ বাহার, ফিরোজ খান ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়

২৬-২৮ | শ্রদ্ধাঞ্জলি

আধুনিক বাংলা গানের শেষ প্রতিনিধির বিদায়

বাংলা অভিনয়ের জগৎ যেমন সাবালক হয়েছিল উত্তম-সুচিত্রা জুটির হাত ধরে, তেমনই বাংলা গান, বিশেষ করে বাংলা আধুনিক এবং ফিল্মের গান সাবালকত্ব লাভ করেছিল হেমন্ত-সন্ধ্যা বা মান্না-সন্ধ্যা জুটির সৌজন্যে। গানকে আধুনিক রূপ দিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা মান্না দে যে কাজটি করেছেন, নারী কণ্ঠে সেই কাজের সূচনা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে। যে কারণে এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলা সংগীতে মহিলা কণ্ঠের আধুনিকতার মূর্ত প্রতীক সন্ধ্যা। এতদিন যিনি ছিলেন সেই ইতিহাসের জীবন্ত দলিল হয়ে। দীর্ঘদিনই জনসমক্ষে গান করতেন না। তথাপি ছিলেন সংগীত জগতের যুগ পরিবর্তনের এক সত্যদ্রষ্টা শিল্পী হিসেবে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ সুতরাং আক্ষরিক অর্থেই যুগাবসান...

২৯-৩০ | শ্রদ্ধাঞ্জলি

‘মধু মালতি ডাকে আয়’

একদিন কলামন্দিরে আমি আর ঊর্মিমালা শ্রুতিনাটক পরিবেশনের পরেই ছিল সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান। প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। আমরা তাঁর অনুমতি নিয়ে উইংসের ধারে বসে গান শুনলাম। অবাক হয়ে লক্ষ করছিলাম, ভাব থেকে ভাবান্তরে ওঁর অনায়াস যাতায়াত। ‘জয়জয়ন্তী’ ছবির ‘আমাদের ছুটি ছুটি’ যখন গাইছেন, তখন মুখমণ্ডলে শিশুর সারল্য আর উল্লাস...

৩১-৩২ | শ্রদ্ধাঞ্জলি

সুরের জাদুতে তিনি নিজেই ইন্ডাস্ট্রি

উত্তম থেকে তাপস, প্রসেনজিৎ অবধি দীর্ঘ ধারাবাহিকতা, এখানেই তিনি একক ইন্ডাস্ট্রি। এই ইন্ডাস্ট্রিকে কখনও বাংলা-হিন্দির গণ্ডিতে বাঁধা যায় না। ‘শরাবি’ ছবিতে তাঁর সুরে ‘দে দে পেয়ার দে’ গানে কখনও থাকতে পারে ‘আল্লা মেঘ দে পানি দে’-র অনুষঙ্গ। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? শুধু ‘ওগো বধূ সুন্দরী’ নয়, উত্তম থেকে প্রসেনজিৎ, তাপস অবধি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে আছে তাঁর গান। আর সেই জনপ্রিয় সুরের ডানাতেই এই ইন্ডাস্ট্রির উড়ান...

৩৩-৩৫ | প্রবন্ধ

ভাষা আন্দোলনে নারীদের অবদান

বাংলার এ ভূখণ্ডের প্রত্যেকটি আন্দোলন সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয়। তেভাগা থেকে ব্রিটিশবিরোধী, ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীন দেশে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন থেকে অদ্যাবধি যতগুলো গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে, তার অধিকাংশতেই শুধু অংশগ্রহণ নয়, সামনের কাতারে ছিল বাংলার নারীরা...

৩৬-৩৯ শ্রদ্ধাঞ্জলি

একুশের গান এবং আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

'ভুলব না, ভুলব না/একুশে ফেব্রুয়ারী, ভুলব না', 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলি ও বাঙ্গালী– রে ভাইরে' কিংবা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী'–একুশের চেতনার শাণিত এমন অজস্র অমর পঙ্‌ক্তি একুশের গানের মর্যাদা লাভ করেছে। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন তথা একুশের চেতনা বাঙালির জীবনকে কত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, এ গানগুলো তার প্রমাণ। কবিতা, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাসের মতই গানের মধ্যেও একুশের চেতনার রূপায়ণ ঘটেছে অনিবার্যভাবে। গীতিকারদের সংবেদনশীল মন মাতৃভাষা বাংলার অপমান সইতে পারেনি।...

৪০ ভারতবিষয়ক কুইজ

আচ্ছা, বলুন তো?

৪১-৪২ নিবন্ধ

বসন্তোৎসব

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ । আর তেরো পার্বণের শেষ হয় বসন্ত উৎসব আর হোলি উৎসবের মাধ্যমে। বাংলা বছর শেষের আগে রঙের উৎসব বসন্ত উৎসব প্রতিটা বাঙালির জীবনে যে আলাদাই এক রঙিন ছোঁয়া নিয়ে আসে তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। দুর্গাপুজো এড়িয়ে শারদোৎসব, বিশ্বকর্মাকে সম্মান দিয়ে শিল্পোৎসব– বাংলাভাষা ও সমাজে শান্তনিকেতন নতুন শব্দ ও ভাবনার সংযোজন করেছে। আজ ধর্মীয়-অনুষঙ্গহীন অনুষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের বসন্তোৎসব...

৪৩-৪৪ উন্নয়ন

বন্দে ভারত ট্রেন ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণ

উন্নত পরিকাঠামোর ফলে একটি দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে, দেশের উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পায়, জনসাধারণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশে নতুন নৌপথ এবং নতুন অঞ্চলে সামুদ্রিক বন্দরগুলোকে বিমান পথে সংযুক্ত করার কাজ দ্রুত গতিতে চলছে এবং নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় রেলওয়ের আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়েছে। রেলের উন্নয়নের গতিকে আরও বৃদ্ধি করতে ৭৫টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করা হচ্ছে, যা দেশের প্রতিটি কোণকে সংযুক্ত করবে।

৪৫-৪৭ ছোটগল্প

শাপ

একটি বেসরকারি সংস্থার মুখ্যগবেষক আফসার সাহেব। বয়স চল্লিশের কিছু বেশি, সম্ভ্রান্ত চেহারা। চাইলে খুব সহজেই তিনি কোন সরকারি দপ্তরের জাঁদরেল অফিসার হতে পারতেন। সেই মেধা ও প্রয়োজনীয় সংযোগ, যাকে আমরা বলি হাই কানেকশান, তা তার ছিল। কিন্তু সেসব কিছু চাননি আফসার উদ্দিন। সেই আফসার উদ্দিন কেন স্ত্রীকে সুখী করতে পারছেন না, অরুণকুমার বিশ্বাসের রহস্যগল্প...

৪৮ শেষ পাতা

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর শৈশবে শিবরাত্রির উপোষ করার সময় মধ্যরাতে দেখেছিলেন শিবলিঙ্গের উপর ইঁদুর উঠে প্রসাদ খাচ্ছে। এই ঘটনা চাক্ষুষ করার পর থেকে তিনি মূর্তিপূজার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। ছেলের আচরণে পরিবর্তন দেখে বাবা তাঁর বিয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন।... পড়ুন তাঁর অভিনব জীবনকাহিনী

সম্পাদকীয়

ফেব্রুয়ারি শোকের মাস। মাতৃভাষার স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রমনার রাজপথে বাঙালি প্রাণ দিয়েছিল পুলিশের গুলিতে। সেই রক্তমাখা সোপান পেরিয়ে ১৯৭১ সালে বাঙালির বিপুল বিজয়– একটি জাতীয় পতাকা অর্জন, একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যুদয়। সেই বিজয় অর্জনে সেদিন পরম আন্তরিকতায় বাঙালির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বিশ্বের অগণিত মানুষ, প্রতিবেশী ভারত এককোটি শরণার্থীকে আশ্রয় ও ভরণ-পোষণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল, মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র দিয়ে, প্রশিক্ষণ দিয়ে, এমনকি নিজের নিয়মিত বাহিনির অজস্র প্রাণের বিনিময়ে বাঙালির সে অর্জনকে সার্থক করে তুলেছিল। প্রথম স্বীকৃতি দিয়ে ভুটান আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছিল। সেদিনের সেই স্বীকৃতির দাম কতখানি, আজকের প্রজন্মের তা বুঝবার কথা নয়! আজকের ভূ-রাজনৈতিক পালাবদলে সে-সব অর্জন-বিসর্জনের কথা না হয় তোলা থাক স্মৃতির গোপন সিন্দুকে।

আজ অন্য কথা বলতে, অন্য এক বেদনার কথা জানাতে এ সম্পাদকীয়র অবতারণা। কিন্তু এমনই সমাপতন, সেই শোকানল আমাদের সইতে হল কিনা সেই ফেব্রুয়ারিতেই। পশ্চিমা এক কবি এপ্রিলকে নিষ্ঠুরতম মাস বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু পুবে আমাদের ভূখণ্ডে ফেব্রুয়ারিই কী নিষ্ঠুরতম মাস! এই ফেব্রুয়ারিতেই আমরা বাঙলা গানের তিন দিকপালকে মাত্র দিন-দশকের ব্যবধানে হারিয়েছি, জানি না, এ বেদনা কার হৃদয়ে কতখানি বেদনা জাগাতে পেরেছে! লতা মঙ্গেশকর উপমহাদেশের অবিসংবাদিত সংগীতসম্রাজ্ঞী, কিন্তু তিনি বাঙলা গানেরও এক মহীরূহ। বাংলা না-জানা এক মারাঠিনীর কণ্ঠে এমন নিখুঁত উচ্চারণে কী করে বাংলাগান গীত হতে পারে, তাঁকে না দেখলে ঠিক বিশ্বাস করা যেত না। বাংলা আধুনিক গানের জগতে ষাটের দশক এক উজ্জ্বল মাইলফলক। অনুরোধের আসরের সেই মধুময় গানের স্মৃতি ভুলি কেমনে!

ও পলাশ, ও শিমুল, কেন এ মন মোর রাঙালে?/ জানি না, জানি না আমার এ ঘুম কেন ভাঙালে
যার পথ চেয়ে দিন গুনেছি/ আজ তার পদধ্বনি শুনেছি
ও বাতাস, কেন আজ বাঁশি তব বাজায়ে/ দিলে তুমি এ হৃদয় সাজায়ে?...

বেশ বড় গান, কিন্তু কী নস্টালজিক! আমাদের বয়সী মানুষদের প্রাক্-কৈশোর স্মৃতি কীভাবে সেইসব গানের কথা ভুলতে পারে! আজকের কিশোর-তরুণদের কাছে সে-সব গানের মর্ম হয়তো পৌঁছবে না, কিন্তু আমরা তাঁকে কীভাবে ভুলে যাব!

৬ ফেব্রুয়ারি লতা মৃত্যুবরণ করলেন। সেই শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতে পনের তারিখে শক্তিশেলের মত বিঁধল আরও দু'টি তীর– সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও বাপ্পি লাহিড়ির চিরপ্রস্থান। সন্ধ্যার গলাটা বড্ড বেশি মিষ্টি, কাঁসার বাটির মত রিনরিনে। 'চন্দন পালঙ্কে শুয়ে একা একা কী হবে, জীবনে তোমায় যদি পেলাম না'... সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের এ আকুতিভরা দীর্ঘশ্বাস আমাদের তরুণমনে কী বেদনাই না সঞ্চার করত! এমনসব গান আর হবে না, এমন করে আর কেউ গাইবেন না...

অনেকটা বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত বাপ্পি লাহিড়ির অনন্তযাত্রার সংবাদ আরব সাগরের তীর থেকে আমাদের কাছে এসে পৌঁছে। অপরেশ লাহিড়ীর সুপুত্র সংগীতজগতে কী মাতলামিই না করলেন! 'আই অ্যাম এ ডিসকো ড্যান্সার' তো মিঠুন চক্রবর্তীকেও অমর করে দিল! করোনার করালগ্রাস এঁদের তিনজনকে কেড়ে নিল– বাংলা গানের জগতকে আরও নিঃস্ব করে দিল!

এঁদের প্রত্যেকের জন্য একেকটি সম্পাদকীয় স্তম্ভ রচিত হতে পারত। মাত্র দশদিনের ব্যবধানে এমন আকস্মিক প্রয়াণ না হলে এঁদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা শোকস্তম্ভ রচিত হত নিশ্চয়ই। পাঠক ক্ষমা করবেন, স্বল্পসময়ে এঁদের ওপর পর্যাপ্ত লেখা সন্নিবেশিত করা সম্ভব হল না। তবে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে...

শ্রদ্ধাঞ্জলি//১

সংগীতসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের মহাপ্রয়াণ

শওকত হোসেন

কথাটা কবি ও গীতিকার জাভেদ আখতারের। লতা মঙ্গেশকরকে নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'যদি বিশ্বের সব সুগন্ধি, সব চাঁদের আলো আর সমস্ত মধু একসঙ্গে করা হয়, তারপরও তা লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠের মত কিছু তৈরি হবে না।' আর মান্না দে বলেছিলেন, 'লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে ঈশ্বর বাস করেন।' আদর করে তাঁকে সুরের জীবন্ত সরস্বতী বলা হত। আর সরস্বতীর পূজার পরের দিনই চলে গেলেন সংগীতের এই মহাতারকা।

বিগত আট দশকজুড়েই তিনি ছিলেন গানের জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন সুরসম্রাজ্ঞী। জন্মেছিলেন ভারতে, বেশি গেয়েছেন মূলত হিন্দি গান, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে শোকে ভাসছেন বাংলাদেশেরও প্রতিটি সংগীতপ্রেমী মানুষ। আনন্দ কিংবা বিষাদে এ অঞ্চলের মানুষ বারবার আশ্রয় নিয়েছেন লতা মঙ্গেশকরের গানে-সুরে-কণ্ঠে। আগামী দিনেও লতা মঙ্গেশকরের গানেই বারবার আশ্রয় নেবেন সংগীতপিপাসুরা।

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ রোববার সকাল ৮টা ১২ মিনিটে মধ্য মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। জানুয়ারি মাসের শুরুতে করোনায় আক্রান্ত হন তিনি। ৮ জানুয়ারি থেকে ব্রিচ ক্যানডি হাসপাতালে ছিলেন। একসময় করোনামুক্ত হলেও পরে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। মধ্যে পরিস্থিতি কিছুটা ভাল হয়েছিল। তবে শনিবার শারীরিক অবস্থার আবার অবনতি হয়। শনিবার সন্ধ্যাবেলা লতাকে দেখতে হাসপাতালে যান বোন আশা ভোঁসলে। তখন থেকে উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সব চেষ্টা ব্যর্থ করে চলে যান লতা মঙ্গেশকর।

জীবনযুদ্ধে লতা

সংগ্রাম করে বড় হয়েছেন, কাটিয়েছেন সাদামাটা জীবন, ছিলেনও মাটির কাছাকাছি একজন মানুষ। লতা মঙ্গেশকর কেবল যে একজন মেধাবী মানুষ ছিলেন, সেটাই শেষ কথা ছিল না– সাধনা, একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতাই ছিল তাঁর আরেক পরিচয়। আজীবন সংগীতেরই মানুষ ছিলেন তিনি।

রাষ্ট্রপতির শোক

ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ (বাসস): রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি এক শোক বার্তায় লতা মঙ্গেশকরের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। শিল্পী লতা মঙ্গেশকরের বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

১৯২৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর এক মারাঠি পরিবারে জন্ম নেন তিনি। বাবা দীননাথ মঙ্গেশকর নাট্য অভিনেতা ও গায়ক ছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল হেমা। বাবাই নাম বদলে লতা ডাকা শুরু করেন। জীবনে প্রথম বাবার সঙ্গে মঞ্চে ওঠেন মাত্র ৯ বছর বয়সে। তবে মাত্র ১৩ বছর বয়সে বাবাকে হারানো লতা মঙ্গেশকরকেই পরিবারের পুরো দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। মা ছিলেন, আরও ছিলেন ছোট ছোট চার ভাইবোন– আশা, উষা, মিনা আর হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর। অর্থ আয়ের জন্য সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন ১৩ বছর বয়সে। অভিনয় তাঁর ভাল লাগেনি। গানের জগতেই থেকে গেলেন সেই থেকে। অনেক পরে রাজ কাপুর তাঁকে নিয়েই সিনেমা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিজের জীবনী নিয়ে সিনেমায় অভিনয়েও রাজি হননি তিনি।

মারাঠি সিনেমা 'কিতি হসাল'-এ প্রথম গান রেকর্ড করেন লতা। ১৯৪৫ সালে চলে আসেন মুম্বই (তৎকালীন বোম্বে)। সেখানে এসে শাস্ত্রীয় সংগীত শিখতে শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে মুক্তি পাওয়া 'শহিদ' সিনেমায় গান গাওয়ার জন্য তিনি দেখা করেন প্রযোজক শশধর মুখার্জির সঙ্গে। কিন্তু 'কণ্ঠ বড় বেশি সরু'– এ কথা বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন লতাকে। এর পরের আট দশকে সেই সরু কণ্ঠেই মজে ছিলেন ভক্তরা।

লতা সংগীত পরিচালক গুলাম হায়দারকে আজীবন 'গডফাদার' মেনে এসেছেন। সবাই যখন বাতিল করে দেন সরু কণ্ঠের লতাকে, তখন গুলাম হায়দারই প্রথম হিন্দি সিনেমার জন্য তাঁর গান রেকর্ড করান। গুলাম হায়দারের বিশ্বাস ছিল, একদিন লতাই সংগীতজগতে রাজত্ব করবেন। আর তাই প্রথম রেকর্ডের দিন গুলাম হায়দার নওশাদ ও অনিল বিশ্বাসের মত বড় বড় সংগীত পরিচালককে আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছিলেন। বিখ্যাত পরিচালক কামাল আমরোহীর প্রথম সিনেমা ছিল মহল। অশোককুমার ও মধুবালা অভিনীত মহলকে বলা হয় ভৌতিক ঘরানার প্রথম হিন্দি সিনেমা। সেই সিনেমায় গান গাইলেন লতা। সুরকার ছিলেন খেমচাঁদ প্রকাশ। লতার গাওয়া 'আয়েগা আনেওয়ালা' হল সুপারহিট। তারপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি লতাকে।

দেশ ভাগ হলে ১৯৪৭ সালে নূরজাহান চলে যান পাকিস্তানে। তখন ধারণা করা হয়েছিল, হিন্দি সিনেমা জগতে এমন এক শূন্যতা তৈরি হয়েছে, যা কখনও পূরণ হবে না। শূন্যস্থান তো পূরণ হলই, বলা যায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেন লতা। তবে শুরুতে লতা নূরজাহানকে অনুসরণ করতেন, একথা নিজেই স্বীকার করেন।

খ্যাতির গগনে

কোকিলকণ্ঠী লতাকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি ঠিকই, তবে সংগ্রাম করতে হয়েছে আজীবন। আরেক কিংবদন্তি সংগীত পরিচালক এস ডি বর্মনের সঙ্গে লতা কোনও গান করেননি ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। সে সময় এস ডি বর্মনের নারীকণ্ঠের প্রায় সব গানই গেয়েছেন লতারই বোন আশা ভোঁসলে। আবার রয়্যালটি প্রশ্নে মতদ্বৈধতা হওয়ায় ষাটের দশকের দীর্ঘ সময় গান গাননি মোহাম্মদ রফির সঙ্গে। আবার আজীবন কোনও অশ্লীল শব্দ বা ভাবধারার গানেও কণ্ঠ দেননি তিনি। তারপরও লতা আজীবনই থেকে গেছেন খ্যাতির মধ্যগগনে।

লতার কণ্ঠে সেরা সব গানের কথা লেখা সহজ নয়, সম্ভবও নয়। তাঁর অপূর্ব ও মধুর কণ্ঠে গাওয়া মধুমতির 'আযা রে পরদেশি', ক্ল্যাসিক্যাল ঢঙে গাওয়া পাকিজার 'চলতে চলতে ইউ হি কোই মিল গ্যায়া', দিল আপনা প্রিত পরাই-এর 'আজিব দস্তান হ্যায় ইয়ে', গাইড-এর 'আজ ফির জানে কি তামান্না হায়', মুঘল-ই-আজম-এর 'জব পেয়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া', অনুপমার 'কুছ দিল না কাহা' বা ও কোন থি সিনেমার 'লাগ জা গলে'– এসবই ষাট আর সত্তরের দশকের এক একটি মুক্তা।

নাসরীন মুন্নি কবিরের লেখা জীবনীতে লতা বলেছেন, ১৯৬২ সালে তাঁকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল। অসুস্থ হয়ে তিন মাস তিনি বিছানাবন্দী ছিলেন। ফিরে এসেই গাইলেন বিশ সাল বাদ সিনেমার সেই রহস্য গলার গান, 'কাহি দীপ জ্বালে কাহি দিল'। আবার একসময় বলা হয়েছিল লাস্যময়ী গলার গান লতা গাইতে পারেন না। ইন্তেকাম সিনেমায় 'আ জানে যা' গান গেয়ে সেই প্রমাণ দিয়ে আর এ ধরনের গানে তেমন আগ্রহ দেখাননি। ১৯৬৩ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পর লতা গাইলেন, 'ইয়ে মেরে ওয়াতন কি লোগো'। গান শুনে

মোদির কাছে শোকপত্র পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী

উপমহাদেশের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে শোকপত্র পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ রোববার নরেন্দ্র মোদির কাছে পাঠানো এ শোকপত্রে ভারত সরকার ও দেশটির জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শোকের এই মুহূর্তে ভারতের জনগণের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে শোক প্রকাশ করছে বাংলাদেশের জনগণ।

শেখ হাসিনা বলেন, প্রয়াত লতা মঙ্গেশকর একজন সাংস্কৃতিক আইকন, একজন কিংবদন্তি ও সর্বকালের অন্যতম মেধাবী শিল্পী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'লতা মঙ্গেশকর তাঁর অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠে বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য গান গেয়েছেন। আমাদের অঞ্চল ও এর বাইরেও লাখ লাখ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, লতা মঙ্গেশকরের বাংলা গান এখন বাংলা সংস্কৃতির ভাণ্ডারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে লতা মঙ্গেশকরের ভূমিকার জন্য তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, লতাজি তাঁর ভারতীয় সহশিল্পীদের সঙ্গে ভারতের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের বিষয়ে প্রচারে ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন।

লতা মঙ্গেশকরের আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করেন প্রধানমন্ত্রী। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যসহ সারা বিশ্বে এই শিল্পীর লাখ লাখ ভক্তের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন শেখ হাসিনা। তিনি তাঁদের এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করেন।

বাপ্পি লাহিড়ির সঙ্গে...

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তার জন্য ভারতীয় অনেক শিল্পীই এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা গান গেয়ে তহবিল সংগ্রহের পাশাপাশি গড়ে তুলেছিলেন বাংলাদেশের জন্য বিশ্বব্যাপী সচেতনতা। ১৯৭১ সালের ২৪ নভেম্বর মুম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের সমর্থনে একটি বড় তারকা সমাবেশ হয়েছিল। সেই সমাবেশে লতা মঙ্গেশকর গান গেয়েছিলেন। সমাবেশে আরও ছিলেন আশা ভোঁসলে, কিশোরকুমার, মোহাম্মদ রফি, মান্না দে, মহেন্দ্র কাপুর, শচীন দেববর্মনসহ হিন্দি চলচ্চিত্র ও সংগীতজগতের প্রখ্যাত সব শিল্পী।

কেঁদেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। আজও ভারতের যে-কোনও সংকটে সবচেয়ে বেশি শোনা যায় এই গানই।

আশি ও নব্বইয়ের দশকে হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। সম্পূর্ণ নতুন এক প্রজন্মের দখলে চলে যায় হিন্দি সিনেমা। কিন্তু লতা থেকে গেছেন তাঁর নিজের জায়গায়। রাজ কাপুরের সত্যম শিবম সুন্দরম বা বাজার সিনেমার 'দিখাইয়ে দিয়ে ইউ কে বেখুদ কিয়া'র মত গান তো আছেই, এমনকি হাম আপকা হ্যায় কউন-এর 'দিদি তেরা দেওর দিওয়ানা', দিলওয়ালে দুলহানিয়া...সিনেমার 'তুজে দেখা তো', ১৯৪২: এ লাভ স্টোরির 'কুছ না কহো' বা রাং দে বাসন্তীর 'লুকা চুপি বহুত হুয়া– আছে এ রকম অসংখ্য উদাহরণ।

বাংলা গানের লতা

প্রায় ৪০টি ভাষায় গান গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। তবে ভালবাসতেন বাংলা গান গাইতে। প্রথম বাংলা গান গেয়েছিলেন ১৯৫৬ সালে, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'আকাশপ্রদীপ জ্বেলে'। প্রথম গানই সুপারহিট। পরিসংখ্যান বলছে, এরপর তিনি ১৮৫টি বাংলা গান রেকর্ড করেন। এ জন্য তিনি সবসময় স্মরণ করেছেন সুরকার সলিল চৌধুরী ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে। একসময় হেমন্তকে নিয়ে কিছু গুজব ছড়ালেও লতা আজীবন তাঁকে ভাই বলেই মনে করেছেন। 'যারে উড়ে যারে পাখি', 'না যেয়ো না', 'নিঝুমও সন্ধ্যায়'– এরকম অসংখ্য বিখ্যাত বাংলা গান গেয়েছেন লতা।

ব্যক্তিজীবনে লতা

বিয়ে করেননি লতা। তবে গুঞ্জন আছে যে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সাবেক সভাপতি প্রয়াত রাজ সিং দুঙ্গারপুরের সঙ্গে তাঁর প্রেম ছিল। তবে লতা তা কখনওই স্বীকার করেননি। বরং ভাল বন্ধুত্বের কথা বলেছেন। লতার ক্রিকেটপ্রেম এই বন্ধুর কারণেই। আর ক্রিকেট জগতে তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আরেক কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার। শচীন লতাকে মা বলতেন।

লতার ভাইবোনেরাও সংগীতজগতের মানুষ। একসময় বোন আশার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা ছিল। এসব পরে আর থাকেনি। ভাই হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের সুরে গেয়েছেন 'ইয়ারা সিলি সিলি'সহ লেকিন সিনেমার বিখ্যাত সব গান।

লতা নিজেও একসময় গোপনে সংগীত পরিচালনা করতেন। তিনি চাননি এ তথ্য কেউ জানুক। সমস্যা দেখা দেয় ১৯৬৫ সালে মারাঠি সিনেমা সাধি মানসে সেরা সংগীত পরিচালকসহ আটটি বিভাগে মহারাষ্ট্র রাজ্য পুরস্কার পেয়ে যাওয়ায়। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রথমে সেরা গায়িকার পুরস্কার নেন লতা। সেরা সিনেমায় সংগীত পরিচালকের নাম ছিল 'আনন্দঘন'। মঞ্চে বারবার নাম ঘোষণা করা হলেও কেউ পুরস্কার নিচ্ছিলেন না। তখন উপস্থাপক লতার নাম বলে দিলে বিষয়টি জানাজানি হয়।

বাংলাদেশের পাশে

লতা মঙ্গেশকরের দরদ ছিল বাংলাদেশের প্রতি। মুক্তিযুদ্ধের সময় শুরু থেকেই বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়েছেন, পাশে থেকেছেন এবং নানা ধরনের কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ সহায়তা তহবিলে এক লাখ টাকা অর্থসহায়তা করেছিলেন। মূলত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তার জন্য ভারতীয় অনেক শিল্পীই এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা গান গেয়ে তহবিল সংগ্রহের পাশাপাশি গড়ে তুলেছিলেন বাংলাদেশের জন্য বিশ্বব্যাপী সচেতনতা। ১৯৭১ সালের ২৪ নভেম্বর মুম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের সমর্থনে একটি বড় তারকা সমাবেশ হয়েছিল। সেই সমাবেশে লতা মঙ্গেশকর গান গেয়েছিলেন। সমাবেশে আরও ছিলেন আশা ভোঁসলে, কিশোর কুমার, মোহাম্মদ রফি, মান্না দে, মহেন্দ্র কাপুর, শচীন দেববর্মনসহ হিন্দি চলচ্চিত্র ও সংগীতজগতের প্রখ্যাত সব শিল্পী।

স্বাধীনতা অর্জনের পরেও লতা মঙ্গেশকর ১৯৭২ সালে প্রখ্যাত অভিনেতা সুনীল দত্তের নেতৃত্বে ভারতের একটি সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে বাংলাদেশে এসেছিলেন। ২০১৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর লতা মঙ্গেশকর এক টুইট বার্তায় সে কথা স্মরণও করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'নমস্কার। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হতেই আমি সুনীল দত্তের গ্রুপের সঙ্গে বাংলাদেশ গিয়ে অনেক কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলাম। সে সময়ে সেনাবাহিনীর উড়োজাহাজে করে সব জায়গায় গিয়েছিলাম।'

লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে সংগীতজগৎ তাঁর সম্রাজ্ঞীকেই হারাল। তবে সিনেমার সমালোচনা লিখে জাতীয় পুরস্কার পাওয়া, আউটলুক ইন্ডিয়ার সিনিয়র এডিটর গিরিধর ঝা লতার চলে যাওয়া নিয়ে যা লিখেছেন, সেটাই বরং মনে করি। তিনি লিখেছেন, 'হিন্দি সিনেমা জগতেরই ভাগ্য যে তারা একজন লতা মঙ্গেশকর পেয়েছিল।'

৯২ বছর বয়সে চলে গেলেন কিংবদন্তি শিল্পী লতা মঙ্গেশকর। করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখান থেকে আর ফিরতে পারলেন না। কোভিডে আক্রান্ত হওয়ায় গত ১১ জানুয়ারি তাঁকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত ছিলেন নবতিপর শিল্পী। প্রথম থেকেই তাঁকে আইসিইউ-তে রাখা হয়েছিল। ৩০ জানুয়ারি শিল্পীর কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট আসে। কিন্তু বয়সজনিত নানা সমস্যার কারণে শেষ পর্যন্ত আর লড়তে পারলেন না তিনি। এর আগেও সঙ্কটজনক অবস্থায় একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিল লতাকে। কিন্তু অনুরাগীদের আশ্বস্ত করে প্রত্যেকবারই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন।

লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে দু'দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য। লতার প্রয়াণে বিভিন্ন রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সোমবার অর্ধ দিবস ছুটি ঘোষণা করে। লতা চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর গান থেকে যাবে যুগ যুগ ধরে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

শওকত হোসেন সাংবাদিক

শ্রদ্ধাঞ্জলি//২

চিরকালের স্মৃতি

রুনা লায়লা

যে লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠ আমার মত কোটি কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে, নিশ্চয়ই এখন তিনি যেখানে আছেন, শান্তিতেই আছেন। লতাজির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হওয়ার মুহূর্তটি এখনও আমার কাছে জ্বলজ্বলে। ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার ফর রিলেশনস আমাকে আমন্ত্রণ জানায়। তাদের আমন্ত্রণে আমি ভারতে যাই। সেখানে তিনটি অনুষ্ঠান করেছিলাম। প্রথম অনুষ্ঠান ছিল দিল্লিতে, দ্বিতীয়টি মুম্বইয়ে, আর শেষটা কলকাতায়। সে সময় আয়োজকেরা আমার কাছে জানতে চান, এমন কেউ কি এখানে আছেন, যাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই? কারও প্রতি কি বিশেষ আগ্রহ আছে আমার? যদি থাকে, তবে সেটা তাঁদের বললে তাঁরা ব্যবস্থা করে দেবেন।

আমি বললাম, আমার একটা প্রত্যাশা আছে। কোনওভাবে কি লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে দেখা করা যায়? তাঁরা জানালেন, 'তিনি তো কোথাও যান না। তা ছাড়া তিনি খুবই চুজি। তবু আমরা চেষ্টা করব।' তাঁদের কথা শুনে ধরেই নিয়েছিলাম, দেখা হবে না। মুম্বইয়ের সম্মুখানন্দ হলের ব্যাক স্টেজে মহড়া করছিলাম। আমার সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে গিয়েছিলেন খ্যাতনামা সংগীত পরিচালক দেবুদা, দেবু ভট্টাচার্য। তিনি কি-বোর্ড বাজাচ্ছিলেন আর পুরো সংগীত ব্যবস্থাপনাটা দেখছিলেন। তিনি ছাড়া স্থানীয় সংগীতজ্ঞরাও ছিলেন। অবাক করা একটা ব্যাপার ঘটল। হঠাৎ দেখি, ব্যাক স্টেজের দরজা দিয়ে কয়েকজন ভদ্রমহিলা ঢুকলেন। এর মধ্যে একজন সাদা শাড়ি পরা। তিনি আমার দিকে আসছেন। তাঁকে দেখে লতাজি লতাজি মনে হচ্ছিল। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? তিনি কেন ব্যাক স্টেজ দিয়ে ঢুকবেন? এরপর দেখি লাল গোলাপ হাতে সত্যি সত্যি লতাজিই আমার দিকে এগিয়ে আসছেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমি গিয়ে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ফুল দিলেন। এর মধ্যে সাংবাদিকেরা খবর পেয়ে গেছেন। তাঁরা এসে ছবি তুললেন। পরদিন পত্রিকায় শিরোনাম হয়েছিল, 'ওয়ান

নাইটিঙ্গেল মিটস অ্যানাদার'। আমরা সেদিন অনেকক্ষণ বসে কথা বলেছিলাম।

আমি লতাজিকে বললাম, 'আপনি তো আমার গান কখনও শোনেননি বোধ হয়।' তিনি বললেন, 'আমি আপনার গান অনেক শুনেছি। পাকিস্তান রেডিওতে আপনার গান বাজানো হয়। আমরা নিয়মিত আপনার গান শুনি। আপনি এসেছেন। আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। শুনে নিজেই চলে এসেছি।' এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া ছিল। লতাজির সঙ্গে সেটাই আমার প্রথম দেখা।

বছরের পর বছর ধরে আমরা ভালবাসা আর পারস্পরিক শ্রদ্ধার একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলাম। সর্বোপরি আমরা বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। প্রায়ই আমাদের মধ্যে মোবাইল ফোনে এসএমএস (খুদে বার্তা) বিনিময় হত। মাঝেমধ্যে আমাদের দীর্ঘ টেলিকথোপকথনের বিষয় ছিল সংগীতকে ঘিরেই। এর বাইরে মাঝেমধ্যে তাঁর অনুমতি নিয়েই সাহস করে আমি তাঁকে খুদে বার্তায় মজার মজার কৌতুক পাঠাতাম। তিনি সেই সেসব খুবই উপভোগ করতেন।

দিদির রসবোধ ছিল প্রবল। তাঁর কিছু অভিজ্ঞতাও আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করতেন। শুনে আমার খুবই ভাল লাগত। তাঁর কিন্নরকণ্ঠ আমার কানে সবসময় সংগীতের মতই মনে হত।

কখনও কখনও খুদে বার্তায় তাঁকে 'শুভ সকাল' জানালে উত্তরে তিনি আমাকে তাঁর পছন্দের জিনিসগুলোর ছবি, ফুল, শিশুদের ছবি পাঠাতেন। কখনও কখনও তাঁর গানের অডিও ও ভিডিও পাঠাতেন, শুনে শুনে যার বেশির ভাগ ততদিনে আমার শেখাও হয়ে গেছে। এগুলো আমার জন্য ছিল তাঁর কাছ থেকে পাওয়া একটি অতিরিক্ত বোনাস।

প্রতিবছর আমার জন্মদিনে তিনি আমাকে একটা শাড়ি পাঠাতেন। এবছর আমাকে বললেন, 'আপনি তো লন্ডন যাচ্ছেন। ঢাকায় ফিরে গেলেই আমি আপনার উপহার পাঠিয়ে দেব।'

লন্ডনে আসার ঠিক আগে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথা হল। আমাকে বললেন, আমার সঙ্গে কথা বলতে তিনি ভীষণ পছন্দ করেন। আমাকে তাঁর পরিবারের খুব কাছের একজন সদস্য বলেই মনে করেন। বলেছিলেন, আমি তাঁর ছোট বোন। আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। আমার প্রতিভাকে সম্মান করেন।

কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন যে, আমাকে ভীষণ মিস করছেন। শিগগিরই যেন তাঁকে দেখতে যাই।

বলেছিলাম, করোনার এই বৈশ্বিক বিপর্যয় কাটলেই আমি তাঁকে দেখতে যাব। কিন্তু তা তো আর হল না। আমি হঠাৎ গভীর এক নির্জনতা আর শূন্যতার মধ্যে ডুবে গেছি। কিন্তু তাঁর সব স্মৃতিই আমার সঙ্গে চিরকাল থাকবে। আর কোনওদিন শুনতে পাব না সেই কিন্নরকণ্ঠ, 'রুনাজি, আপনি কেমন আছেন?'

দিদি, আপনি আমাকেসহ অগণিত মানুষকে বহু কিছুই দিয়েছেন। তবে অনেকের চেয়ে আপনি আমাকে বেশিই দিয়েছেন। এ জন্য আমি আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ।

আপনি আমাকে আপনার শেষ খুদে বার্তাগুলোতে যে আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন, তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি আপনার আশীর্বাদ আর ভালবাসা শেষ অবধি লালন করব।

রুনা লায়লা প্রথিতযশা কণ্ঠশিল্পী

'ওঁকে অনুসরণ করেই বড় হয়েছি'

হৈমন্তী শুক্লা

লতা মঙ্গেশকরকে কবে থেকে চিনি? সেই কোন ছোট্টবেলা থেকে। তখন ঠিক মতো ফ্রকও পরতে শিখিনি। টেপ ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াতাম। কিন্তু ওঁর গান ঠোঁটস্থ। কেউ গাইতে বললেই গেয়ে উঠতাম, 'আয়েগা আনেওয়ালা।' আস্তে আস্তে বড় হয়েছি। ধীরে ধীরে লতা মঙ্গেশকর যেন আমার মধ্যে আত্মস্থ হয়েছেন। সেই সময়ে এটাই যেন রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল। আমি এবং আমার সময়ের বাকি গায়িকারা ওঁকে অনুসরণ করেই বড় হয়েছি।

ওঁর গাওয়া গানের অদ্ভুত আকর্ষণ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওগুলোই বারবার গেয়ে উঠতাম। শুধু আমাদের প্রজন্মই বা বলি কী করে! বিশুদ্ধ বাংলায় বললে, শ্রেয়া ঘোষালও তো ওঁকে প্রায় অনুকরণ করেই আজকের শ্রেয়া ঘোষাল হয়েছেন!

তবে ওঁর হিন্দি গানের থেকেও বাংলা গানগুলোর প্রতি আমার বেশি মায়া, বেশি দরদ। প্রথম যখন লতা দিদি বাংলা গান গাইতে আরম্ভ করেছেন তখন থেকে। 'বাঘিনী', 'মন নিয়ে' ছবিতে একের পর এক ওঁর গাওয়া গান হিট। আমি তখন সেই গানগুলোই গাইতাম। ওই গানগুলোই আমার গলায় শুনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তুই এই গানগুলো গাইছিস কেন?' আমিও অকপটে স্বীকার করেছিলাম, ওঁর হিন্দি গানের থেকেও বাংলা গানের প্রতি আমার দরদ বেশি। হিন্দি গানগুলো গাইলেও বাংলা গানের দিকে মন পড়ে থাকত।

যাঁর গান এত গাই, সেই লতা দিদির প্রথম মুখোমুখি হওয়া আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। একবার উনি কলকাতায় এসেছেন অনুষ্ঠান করতে। গ্র্যান্ড হোটেলে উঠেছেন। সেই সময়ে সুপ্রকাশ গড়গড়ি ফোন করে জানালেন, লতাজি আমায় ডেকেছেন। উনি কিছু বাংলা গানের কথা ভুলে গিয়েছেন। আমার সব গান মুখস্থ থাকে জেনে সহযোগিতার জন্য ডেকেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। তখনই দেখেছিলাম, ওঁর একটি ব্রিফকেশ ভর্তি গানের মোটা মোটা খাতা! সেখানে সব গান যত্নে লেখা। তার মধ্যে কয়েকটি বাংলা গান হারিয়ে ফেলেছেন। আমাকে বসিয়ে সে-সব শুনে নতুন করে তুলে নিলেন খাতায়।

প্রথম দিনেই কত কথা আমার সঙ্গে! আমায় গাইতেও অনুরোধ জানালেন। তারপর হঠাৎ জানতে চাইলেন, শুক্লা পদবি কি বাঙালি? আমি জানিয়েছিলাম, আমার জন্ম, কর্ম সবই বাংলায়। আমি বাঙালিই। তবে আমার বাবার দেশ উত্তরপ্রদেশ, লক্ষ্ণৌ। শুনেই ওঁর রায়, ওই জন্যই নাকি আমার গলা এত মিষ্টি, সুরেলা। সঙ্গে সঙ্গে আমার বিনীত প্রতিবাদ ছিল, বাঙালিরা কি সুরে গাইতে পারে না? এর পরেও দেখা হয়েছে কয়েকবার। দুর্গাপুরে একবার 'লতা মঙ্গেশকর নাইট' হয়েছিল। সেখানে আমরা বাংলার শিল্পীরাও গিয়েছিলাম। ওঁর পরে আমরা গাইব। কিংবদন্তি শিল্পী। কিন্তু মঞ্চে ওঠার আগে নার্ভাস! ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত তখনও। একটি গান গাওয়ার পরে আমায় জিজ্ঞেস করছেন, হৈমন্তী, ঠিক গেয়েছি তো? শুনে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না! আমায় ডেকে কী বললেন দিদি? 'সত্যম শিবম সুন্দরম'-এর বিখ্যাত গানটি গাওয়ার সময়ে লতা দিদি আয়োজককে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'আমার এই গানে তুমি কোরাস গাইবে?' অন্য কোনও শিল্পী অনুরোধ জানালে রাজি হতাম কিনা সন্দেহ। জীবন্ত দেবী সরস্বতীর সঙ্গে এক মঞ্চ ভাগ করার সুযোগ সেদিন কিন্তু ছাড়িনি! হৈমন্তী শুক্লা ভারতের সংগীতশিল্পী

শ্রদ্ধাঞ্জলি//৩

সংগীতের ধ্রুবতারা

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর কণ্ঠে ভারত আবহমান ভারতীয় সংগীত বদলেছে, লতা ধ্রুবতারা হয়ে থেকেছেন। লতা মঙ্গেশকরের গানের সংখ্যা কত, তিনি নিজেও জানতেন না। নানা ভাষায় গাওয়া সেই সব গানের সব শোনাও সম্ভব হয়নি জীবনে।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল 'ইয়ে জিন্দেগি উসিকি হ্যায়' শুনে। মফস্সলের কিশোরের চোখ ভেসেছিল আনারকলির বেদনায়। এমন প্রেমকে আঘাত করলে কোনও সাম্রাজ্যই স্থায়ী হয় না। এমনই মনে হয়েছিল সে-বয়সে। তখনও আনারকলি-র নাট্য-আখ্যানের সত্যতা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়নি। কিন্তু জন্মের বহু আগে তৈরি সে-ছবিতে সি রামচন্দ্রের সুরে লতা মঙ্গেশকর কোন জাদুতে আমার মত সাধারণ কিশোরের মনেও বীণা রায়কে জীবনের প্রথম প্রেমিকা এঁকে দিয়ে গেলেন! ১৯৫৩ সালের একই ছবিতে রাজিন্দর কৃষ্ণনেরই কলমে আর একটি গান 'জাগ দর্‌দ ইশক জাগ'। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে লতা! মায়া-সভ্যতা বোধ হয় একেই বলে! লতা ধরছেন 'কিসকো শুনায়ু দাস্তাঁ' থেকে, সামান্য আলাপি আউচারের পর। ১৯৬০ সালে একই আখ্যানের আর এক রুপোলি বয়ান মুঘল-এ-আজম। প্রেমিকা বদলে গেল আমার।

নাদিরা বীণা রায়ের জায়গায় এলেন নাদিরা মধুবালা। উপমহাদেশের প্রবচন-পদাবলি হয়ে উঠল নৌশাদের সুরে 'পেয়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া'। ওই ছবিতেই তানসেনের ভূমিকায় গাইছেন উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান– 'প্রেম যোগন বন কে'। উস্তাদজি ফিল্মে গাইতে অরাজি। একটি গানের জন্যই এমন বিপুল টাকা চেয়েছিলেন, যাতে পরিচালক কে আসিফকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। ফিরে যাননি পরিচালক। ওই একই ছবিতে নৌশাদ লতাকে দিয়ে গারা রাগে গাওয়াচ্ছেন দাদরা তালে ঠুমরি 'মোহে পনঘট পে', যে-গানে 'মোরি সারি আনাড়ি' অংশে এক অনতিক্রম্য লাস্যে ঠোঁট ফুলে উঠছে মধুবালার। সেই লাস্যভাব মূলত তৈরি হচ্ছে ওই মরাঠি কণ্ঠশিল্পীর গায়কিতেই। এমন গায়নভঙ্গি বিশ্বসংগীতের সম্পদ।

লতা মঙ্গেশকরের গানের সংখ্যা কত, তিনি নিজেও জানতেন না। নানা ভাষায় গাওয়া সেই সব গানের সব শোনাও সম্ভব হয়নি জীবনে। এক জীবনে তিনি যা করে গিয়েছেন, সাধারণ শ্রোতার পক্ষে এক জীবনে তার রসাস্বাদন অসম্ভব। হিমশৈলের চূড়ার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করার থাকে! উষা মঙ্গেশকরের সঙ্গে লতা গেয়েছিলেন 'অপলম-চপলম'। ১৯৫৫ সালের আজাদ ছবির সে-গান যুগল নাচের সঙ্গে। অতিদ্রুতি সে-গানের। অতিদ্রুত ঝালা বাজছে যেন। 'ওয়ান-টেক' রেকর্ডিংয়ে কী করে সম্ভব হল সে-কাজ, ভাবলে পাথার অকূলই হয়! এই লতাই শিব-হরির সুরে ১৯৮২ সালে সিলসিলা ছবিতে যখন গাইছেন 'ইয়ে কাঁহা আ গয়ে হম', মনে হচ্ছে বিশাল ডানার বিষাদ-পাখির অবতরণ ঘটছে। করুণ-নিস্তেজ শান্তি চরাচর দখল করে নামছে যেন। আবার বিমল রায়ের মধুমতী ছবিতে, যার চিত্রনাট্য ঋত্বিক ঘটকের, সলিল চৌধুরীর সুরে 'আযা রে পরদেশি' গানে তাঁর গলা অতিপ্রাকৃত, ছায়াময়, নিশিডাকের সমতুল হাতছানি। গানে এই অবিশ্বাস্য নাটকীয়তার আরেক নাম লতা মঙ্গেশকর।

লতা মঙ্গেশকর এক সাবেক সিন্দুকেরও নাম। যে-সিন্দুকে এক সঙ্গে নানা প্রজন্মের পরম্পরা প্রতিনিধিত্ব করে। সে-সিন্দুকে ঠাকুমা-দাদুর আবছা-ধূসর ছবিও আছে, আছে নিজের বাল্যবেলার পোশাক, আছে নাতি-নাতনির খেলনাও। ছায়াছবি এবং বেসিক রেকর্ডের ইতিহাসে সুরকার, গীতিকার, সংগীতায়োজক প্রতি প্রজন্মে বদলেছেন। এসেছে নতুন নতুন আঙ্গিক। প্রযুক্তিও বদলেছে সমান তালে। এই সবকিছুর মধ্যে ধ্রুব থেকে গিয়েছেন লতা। যুগের সঙ্গে তিনিও নিজেকে বদলেছেন, কিন্তু 'লতাত্ব' অটুট রেখেই। সি রামচন্দ্র, মদনমোহন, নৌশাদ, শচীন দেব বর্মণ, জয়দেব, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, রাহুল দেব বর্মণদের মত সুরকারের নাক্ষত্রিক অভিকর্ষেও আপন বলয়ছন্দে সাবলীল তিনি যেমন, তেমনই পরবর্তী বহু সুরকারের কাজেও প্রতিস্পর্ধী স্পন্দে নন্দিত। এ আর রহমানের সুরের প্রাচ্য-প্রতীচী অর্কেস্ট্রেশনের রসায়নাগারেও তাঁর তুলনা একমাত্র তিনি। 'রং দে বসন্তী'র 'লুকাছুপি' সবার পক্ষে গাওয়া সম্ভব নয়।

গান মাঝেমধ্যে সময় ও ইতিহাসের দলিল হয়ে ওঠে। লতা মঙ্গেশকরের অজস্র গান তেমনই মাইলফলক। যেমন, ১৯৬৩ সালের 'অ্যায় মেরে বতন কে লোগো' জাতীয়তাবাদের সমার্থক হয়ে রইল। যেমন 'ঝিলমিল সিতারোঁ কা' হয়ে রইল প্রেমবাসনার চিরন্তন কল্পকথা। যেমন, 'সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম' হয়ে রইল স্পর্শগন্ধি ভক্তিমার্গের উচ্চারণ। যেমন, মরাঠি মেয়ের বাংলা গানের অমিয় সম্ভার হয়ে রইল বাঙালির নিজস্ব-আপন। 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে'!

তাঁর গানভুবন, তাঁর উচ্চারণের জাদু, তাঁর হাত-পা-মুখ-শরীর স্থিরনির্লিপ্ত রেখে দাঁড়িয়ে স্বরপ্রক্ষেপণের নিঃসীম তরবারি– মহাবিশ্ব আর কখনও পেয়েছে বলে মনে হয় না। আরও একটি বিষয়– উপমহাদেশের মার্গগান এবং লোকগানের উপর তাঁর দাপুটে দখল। নানা রাজ্যের লোকসংগীত লতার কণ্ঠে নাগরিকতার ভিন্ন মাত্রায় অনূদিত। হিন্দি চলচ্চিত্রে বাংলা, পঞ্জাব এবং দক্ষিণী সুরের প্রভাব আগে থেকেই ছিল। নৌশাদ তাতে যোগ করেছিলেন উত্তর ভারতের লোকগানের আঙ্গিক। এই সব বয়ানেই লতা চাহিদার নিযুত শতাংশ বেশি উপহার দিয়েছেন। রাগসংগীতের ব্যবহারে সুরকারদের চিন্তা থাকত না লতা মঙ্গেশকরকে পেলে। কারণ, তাঁর সারস্বত স্পর্শে সেখানে তানকারির আগুনে কাব্য বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকত না। 'ইচকদানা বিচকদানা' রাগনিবদ্ধ হলেও লতায় তার আলাদা নার্সারি রাইমের পরিভ্রমণ। একইভাবে তাঁর 'যাও রে যোগী তুম যাও রে' গানের রাগাশ্রয় গড়ে তোলে শঙ্কর জয়কিষণের প্রার্থিত মাথুর-আন্দাজ। লতার কণ্ঠে চলচ্চিত্র এবং বেসিক রেকর্ডে রাগসংগীতের ব্যবহার যে-কোনও সংগীত-গবেষকের বিপন্নতার মোক্ষম কারণ।

রেকর্ডিংয়ে তাঁর কতক্ষণ সময় লাগবে, তা ব্রহ্মাণ্ডের কারও জানা ছিল না। এমনও ঘটেছে, সকাল ন'টায় স্টুডিয়োয় ঢুকে পরের দিন ভোর পর্যন্ত ব্যস্ত থেকেছেন, ব্যস্ত রেখেছেন প্রায় দেড়শো যন্ত্রী ও পঞ্চাশজন সহকণ্ঠশিল্পীকে। কারণ, নিজের গাওয়া তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। কী সেই গান? 'ঘর আয়া মেরা পরদেশি'। তাঁকে দিয়ে গাওয়ানোর আগে সুরকারেরা লতার এই নাছোড় মনোভাবের কথা মাথায় রাখতেন।

সংগীত সাধনায় তাঁর একাগ্রতা তাঁর স্বোপার্জিত। উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর মতে, তিনি 'উস্তাদোঁ-কে-উস্তাদ'। উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁর প্রত্যয়, 'সুরেলি লতা' চেষ্টা করেও জীবনে বেসুর গাইতে পারবেন না। পণ্ডিত ভীমসেন জোশী তাঁকে ডাকতেনই 'ভারতরত্ন' নামে। এঁরা সবাই উচ্চাঙ্গ সংগীতে কিংবদন্তি শিল্পী। কিন্তু মার্গসূত্রের স্থিরনিবদ্ধ সঞ্চারগতি ছেড়ে গানের নানা ধারায় বহমান শিল্পী লতা মঙ্গেশকরের মধ্যে তাঁরা সংগীতের আবহমানতাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, বিস্মিত হয়েছেন গানের শাখাপ্রশাখায় কোকিলকণ্ঠীর অনায়াস উড়ানে। সাধনধর্মেই লতা মঙ্গেশকর সরস্বতীর ব্যক্তিপ্রকাশ।

গানের সাধিকা, আধুনিক মীরাবাই লতা মঙ্গেশকর এক অনির্বচনীয় শ্রুতিসঞ্চয়, এক মহাজাগতিক বিস্ময়, যা সত্য না কি মায়া, বোঝা কঠিন। তাঁর মহাপ্রয়াণের অর্থ পৃথিবী থেকে একখণ্ড পৃথিবীর ছিটকে যাওয়া। মহাত্মা গান্ধী বিষয়ে যেমন বলেছিলেন আইনস্টাইন– ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এটা ভেবেই বিস্মিত হবে যে, রক্তমাংসের এমন একজন সত্যিই একদিন এই পৃথিবীর মাটিতে ঘুরে বেড়াতেন– উপমহাদেশের নন্দনকলায় লতা মঙ্গেশকর সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের সংগীতশিল্পী

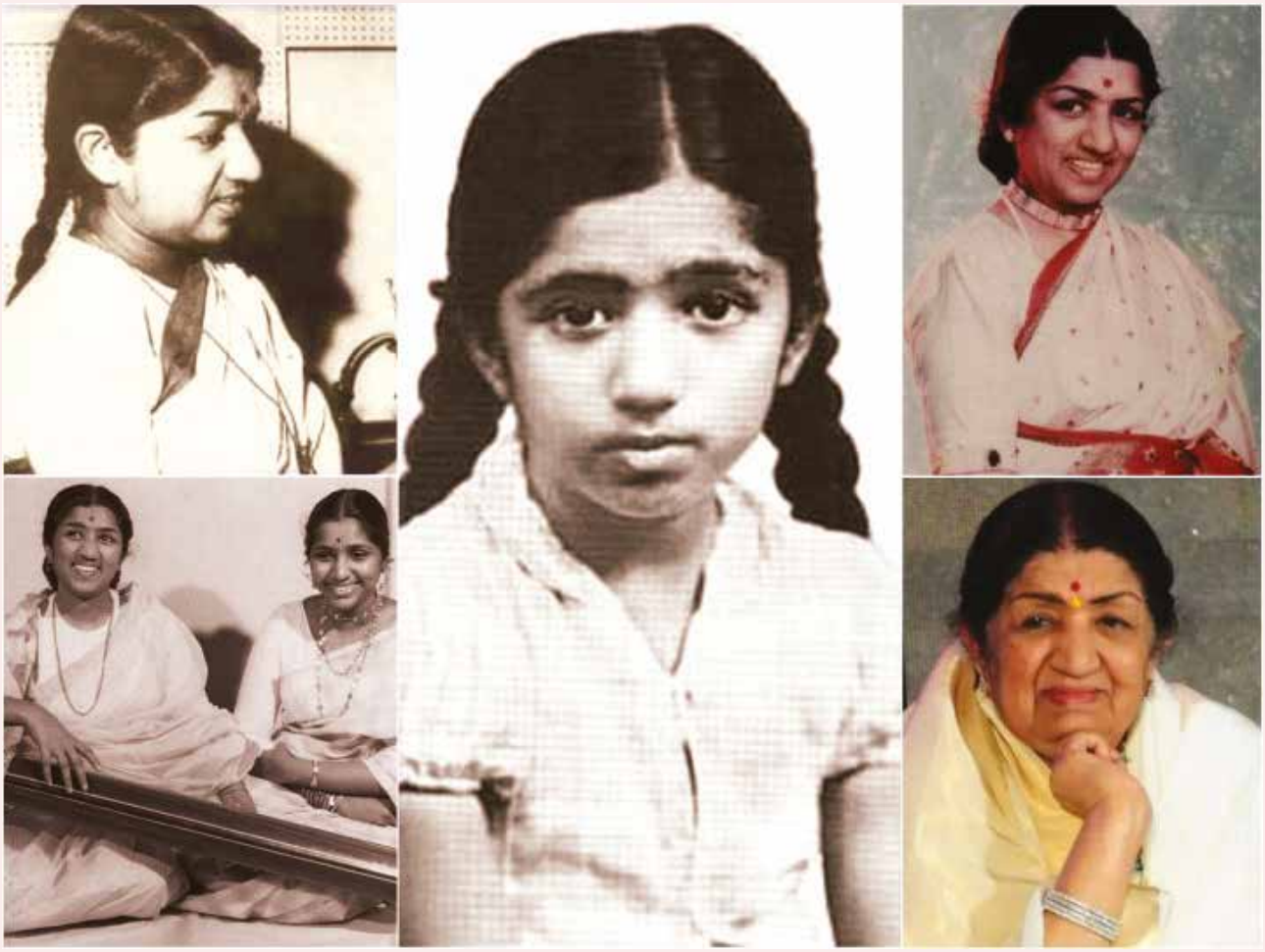

লতা মঙ্গেশকর

১০টি অজানা তথ্য

হাসপাতালে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর চলে গেলেন উপমহাদেশের সংগীতের প্রবীণ মহাতারকা লতা মঙ্গেশকর। চলুন জেনে নিই তাঁর কর্মবহুল জীবনের অজানা কিছু তথ্য...

১. 'নাইটিঙ্গেল অফ ইন্ডিয়া' বলে আখ্যা পাওয়া লতা মঙ্গেশকর অর্ধশত বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে আঞ্চলিক, দেশি-বিদেশি মিলিয়ে গেয়েছেন ৩৬টি ভাষায় প্রায় ৩০ হাজার গান। ১ হাজারের বেশি সিনেমায় রয়েছে তার দেওয়া কণ্ঠ। মাতৃভাষার পর তিনি সবচেয়ে বেশি গান গেয়েছেন বাংলা ভাষায়। বাংলায় উল্লেখযোগ্য গান 'প্রেম একবার এসেছিল নীরবে', 'আষাঢ়-শ্রাবণ মানে না তো মন', 'ও মোর ময়না গো', 'ও পলাশ ও শিমুল', 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে'সহ অনেক বিখ্যাত বাংলা গানের কণ্ঠ তাঁর।

২. ১৯৪২ সালে মারাঠি সিনেমা 'কিতি হসাল' সিনেমায় প্রথম প্লে ব্যাক করেন লতা মঙ্গেশকর। কিন্তু 'নাচু ইয়ে গাধে, খেলু শারি মারি' নামের এই গানটি সিনেমার ফাইনাল কাটে ফেলে দেয়া হয়। জীবনের প্রথম প্লে ব্যাকের গানই প্রকাশিত হয়নি লতার।

৩. লতা মঙ্গেশকর গান গাওয়ার সময় একবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। ফার্স্টপোস্টকে দেয়া এক ইন্টারভিউয়ে লতা বলেন, 'একবার গরমের দিনে মুম্বইতে মিউজিক কম্পোজার নওশাদের সাথে আমরা এক গান রেকর্ড করছিলাম। মুম্বইতে তখন অনেক গরম। অফিসে এসি ছিল না। রেকর্ডিংয়ের জন্য সিলিং ফ্যানও বন্ধ ছিল। ব্যস, গরমে আমি বেহুঁশ হয়ে গেলাম।'

৪. লতাজির প্রথম উপার্জন ছিল ২৫ টাকা । প্রথমবার মঞ্চে গাওয়ার জন্য লতা ২৫ টাকা উপার্জন করেছিলেন। লতা ১৯৪৪ সালে মারাঠি ছবি 'কিতি হসাল'-এর জন্য প্রথম গান গেয়েছিলেন।

৫. বলিউড হাঙ্গামায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে লতা বলেছিলেন, তিনি নিজের গান নিজে কখনও শোনেন না। তিনি বলেন, 'আমি আমার গান শুনলে হাজারটা ভুল খুঁজে পাবো, সেজন্য শুনি না।'

৬. ভারতীয় সংগীতের আরেক কিংবদন্তি শিল্পী মোহাম্মদ রফির সঙ্গে প্রায় তিন বছর কোনও গান করেননি লতা। পরে এক সাক্ষাৎকারে লতা বলেন, তাঁরা সংগীতের রয়্যালটি নিয়ে ঝগড়া করেছিলেন। ১৯৬০-এর দশকে শিল্পীদের একটি সমিতি ছিল। মুকেশ, তালাত মাহমুদরা তখন একটি দাবি তুলেছিলেন, শিল্পীদের তাঁদের প্রাপ্ত সম্মানী বুঝিয়ে দিতে হবে। যদিও লতা রয়্যালটি পেতেন, কিন্তু তিনি এই দাবি সমর্থন করেন। আর মোহাম্মদ রফি এ দাবির বিরোধিতা করেন। এই নিয়েই দু'জনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। লতা দাবি করেছেন, পরে রফি ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। এরপর তাঁরা শংকর-জয়কিষাণের সুরে গান করেন। যদিও রফি-পুত্র শহীদ রফি এ কথার প্রতিবাদ করে বলেন, এমন কোনও চিঠি রফি লেখেননি।

৭. বলিউডে লতা মঙ্গেশকরকে নিজের ছোট বোনের মত দেখতেন দিলীপকুমার। আবার লতাও দিলীপকুমারকে সব থেকে কাছের মানুষ মনে করতেন ইন্ডাস্ট্রিতে। একবার দিলীপকুমার লতার উপর খুব রেগে গিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে লন্ডনের রয়্যাল অ্যালবার্ট হলে লতা নিজের প্রথম প্রোগ্রাম করছিলেন, যেখানে অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য দিলীপকুমারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। দিলীপকুমার নিজের কাজ ভীষণ মন দিয়ে করতেন এবং ছোট ছোট বিষয়ে খুব গুরুত্ব দিতেন। পাকিজা ছবির গান 'ইনহি লোগো নে লে লি দুপাট্টা মেরা' এই গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করতে নিমরাজি ছিলেন তিনি। লতাজিকে দিলীপকুমার প্রশ্ন করেছিলেন, 'অনুষ্ঠানের শুরুতেই এই গানটি কেন করতে চাইছেন আপনি?' লতা তখন দিলীপকুমারকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে এই গানটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি গান এবং মানুষ এটি শুনতে চাইছেন। কিন্তু দিলীপকুমারকে কোনওভাবেই বোঝানো যায়নি। তিনি ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন।

৮. লতা মঙ্গেশকর ভারতীয় রাজ্য সভার সদস্যও ছিলেন। ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় পার্লামেন্টের এমপি ছিলেন। যদিও রাজ্য সভায় সদস্য পদ নিয়ে তিনি খুব একটা সুখী ছিলেন না, এমনকি তিনি রাজনীতিতে আসতে চাননি বলেও জানান।

৯. সংগীতের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গান রেকর্ডের ইতিহাস আশা ভোঁসলের। তিনি গেয়েছেন প্রায় দশ হাজার গান। গিনিজ বুকে এ রেকর্ডটি ছোট বোন আশার হওয়ার আগে ছিল লতা মুঙ্গেশকরের। লতা গেয়েছেন প্রায় সাড়ে সাত হাজার গান।

১০. যতীন মিশ্রর বই, 'লতা সুরগাঁথা'য় লতাজি বলেছেন, 'প্রায়ই রেকর্ডিং করতে করতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়তাম আমি, আর ভীষণ খিদে পেত আমার। তখন রেকর্ডিং স্টুডিওতে ক্যান্টিন থাকত, তবে নানা রকম খাবার পাওয়া যেত কি না, সে বিষয়ে আমার মনে নেই। তবে চা-বিস্কুট খুঁজে পাওয়া যেত তা বেশ মনে আছে। এক কাপ চা আর দু'চারটে বিস্কুট খেয়েই সারাদিন কেটে যেত। এমনও দিন গেছে যেদিন শুধু পানি খেয়ে সারাদিন রেকর্ডিং করছি, কাজের ফাঁকে মনেই আসেনি ক্যান্টিনে গিয়ে কিছু খাবার খেয়ে আসতে পারি কিনা। সারাক্ষণ মাথায় এটাই ঘুরত যেভাবে হোক নিজের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে হবে আমাকে।' • সংকলিত

একাত্তরের বন্ধু-স্বজন, ভালবাসা

দরজা খুললেন লতা মঙ্গেশকর স্বয়ং। মুখে সেই চিরপরিচিত মিষ্টি হাসি। রিনিঝিনি কিন্নরকণ্ঠে শুধালেন, "ভাল আছো? কেন এসেছো?"

"আমরা বাংলাদেশের জন্য ফান্ড কালেক্ট করছি। শরণার্থী এবং আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনা হবে এই ফান্ড থেকে। আপনারও সাহায্য চাই দিদি।"

মৃন্ময়ীকে বসিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেলেন লতা মঙ্গেশকর। বেরিয়ে আসলেন চেক বই হাতে। গুটিগুটি হাতে চেক লিখে এগিয়ে ধরলেন। অংকের ঘরে চোখ পড়তে কিছুটা চমকেই উঠলেন মৃন্ময়ী বোস। এক লক্ষ রুপি। ১৯৭১ সালে এক লক্ষ রুপি মানে কম টাকা ছিল না।

কিন্তু আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছে মৃন্ময়ী বোসের জন্য। নিজের গাওয়া কিছু বিখ্যাত গানের রয়ালিটি লতা মঙ্গেশকর সেদিন লিখে দিয়েছিলেন ফান্ডের নামে। যতদিন মুক্তিযুদ্ধ চলবে ততদিন এইসব গান থেকে প্রাপ্ত অর্থ জমা হবে ফান্ডে। বাংলাদেশের ফান্ডে।

এখানেও শেষ নয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপনেও অর্থ সাহায্য করেছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালে অজন্তা শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্লেনে চেপে বিভিন্ন স্থানে গান পরিবেশন করে বাঙালি রিফিউজিদের জন্য তহবিলও সংগ্রহ করেছিলেন এই কিংবদন্তী। পাশাপাশি গড়ে তুলেছিলেন বাংলাদেশের জন্য বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা। ২০১৯ সালে করা এক টুইট বার্তায় সেসব দিনের কথা স্মরণ করেছিলেন তিনি। একাত্তরের বন্ধু-স্বজন, ভালবাসা, শ্রদ্ধাঞ্জলি ও কৃতজ্ঞতা।

• সংগৃহীত

শেষ অবধি একুশটা টেকের পর ফাইনাল হল ‘বন্দে মাতরম্’। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন সুরকার। ৭০ বছর আগে। গানটির শিল্পী লতা মঙ্গেশকর।

‘গানে প্রাণ পাচ্ছি না’

কলকাতা থেকে বম্বে এসেছেন এক সুরকার। নিজের সুরে প্রথম হিন্দি ছবিতে গান গাওয়াতে চাইলেন লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে। শুনে প্রযোজনা সংস্থার মালিক বললেন, ‘লতা এখানে আসবেন না, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল নয়।’ সুরকার যদি ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁকে নিয়ে আসতে পারেন, তাতে সংস্থার আপত্তির কিছু নেই। অগত্যা সুরকার নিজেই চলে গেলেন লতাজির বাড়ি। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে অবাকই হতে হল তাঁকে। লতা মঙ্গেশকর বললেন– ‘আপনাকে আমি চিনি, নাম শুনেছি। আপনি যখন নিজে এসেছেন, আমি আপনার জন্যই গাইব।’ পারিশ্রমিক পর্যন্ত নিতে চাইলেন না। কিন্তু ফিল্মিস্তান-এ গিয়ে কাজ করতে তাঁর অনিচ্ছা। সুরকার প্রস্তাব দিলেন, তাঁর বাড়িতে এসে গান তোলার। সৌজন্য ও আন্তরিকতায় লতা মঙ্গেশকর তাতেই রাজি। দাদা-বোনের মত ঘরোয়া সম্পর্কের সূত্রপাত এ ভাবেই। গান তোলা হল। এবার রেকর্ডিং-এর পালা।

ছায়াছবির একটি দৃশ্যে বিপ্লবীরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বেরোচ্ছেন ঘোড়ায় চড়ে। ঘোড়সওয়ারির সঙ্গে তাল রেখে বাজবে দেশাত্মবোধক গান। মূল গান অতি পরিচিত, একাধিক শিল্পী বেসিক রেকর্ডে বা রেডিয়োয় গেয়েছেন। হিন্দি চলচ্চিত্রেও আগে গানটি ব্যবহৃত হয়েছে, 'অমর আশা' (১৯৪৭), 'আন্দোলন' (১৯৫১)-এর মতো ছায়াছবিতে। কিন্তু এ বার যে সুর দিয়েছেন সুরকার, তা অন্য ধরনের। সেই সুরে গানটি গাইছেন লতা মঙ্গেশকর। একের পর এক টেক দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু চলচ্চিত্র পরিচালকের আর কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য, 'গানে প্রাণ পাচ্ছি না।' সুরকারও পড়েছেন রীতিমতো অস্বস্তিতে, এতবার 'টেক' করতে হলে বিরক্ত হয়ে লতাজি চলে যাবেন না তো? কিন্তু লতা মঙ্গেশকর পূর্ণ সহযোগিতা করলেন। বললেন, যতক্ষণ পরিচালকের না পছন্দ হচ্ছে, তিনি গেয়ে যাবেন। শেষ পর্যন্ত একুশ বার 'টেক'-এর পর মিলল সবুজ সঙ্কেত। এত কাণ্ডের পর গানটি মুক্তি পেল ১৯৫২ সালে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত, হেমেন গুপ্তর পরিচালনায় হিন্দি 'আনন্দমঠ' ছবিতে। সুরকার হেমন্ত কুমার, অর্থাৎ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বাকিটা ইতিহাস।

'আনন্দমঠ' ছবিটি তখন 'হিট' করেনি, কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' গানের ওই অভিনব সুর ভারতবাসীর দেশপ্রেমের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে গেল অচিরেই।

১৮৭৫ সালের নভেম্বরে গানটি লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রথম প্রকাশ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। পরে তিনি এটি ব্যবহার করলেন 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসে। পাদটীকায় লেখা ছিল, গানটি মল্লার রাগ, কাওয়ালি তালে বাঁধা। বিষ্ণুপুর ঘরানার সংগীতজ্ঞ যদুভট্ট (যদুনাথ ভট্টাচার্য) এই রাগেই গানটিতে সুরারোপ করে শুনিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে, যদিও সে স্বরলিপি প্রকাশ পায়নি। এরপর ১৮৯৬ সালে কলকাতায় আয়োজিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গানটির প্রথম দুই স্তবক শোনা গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সুরে, তাঁরই কণ্ঠে। এতে সুর দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে একাধিক বরেণ্য সুরকার, বিভিন্ন সময়ে। অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো-র সংরক্ষণে যে প্রচলিত সংস্করণটি রয়েছে, তা দেশ রাগে আধারিত। পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পালুস্কর সুর দিয়েছিলেন কাফি রাগের আশ্রয়ে। তিমিরবরণ ভট্টাচার্যের দেওয়া সুর ছিল দুর্গা রাগে। দেশকর এবং তিলক কামোদ-আশ্রিত সুরেও গানটি গেয়েছিলেন একাধিক শিল্পী। এই জাতীয় নির্দিষ্ট রাগভিত্তিক সুররচনা সাধারণত স্তোত্র বা বন্দনাগীতির আঙ্গিকে গড়ে ওঠে। কিন্তু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'বন্দে মাতরম্' হয়ে উঠল 'মার্চিং টিউন'। দেশসেবক 'সন্তানদলের যুদ্ধযাত্রার দৃশ্যের নাটকীয় আবেদন এ গানকে আলাদা এক মাত্রা দিয়েছে। সমগ্র কম্পোজিশনের মধ্যে ধরা দিয়েছে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর নানা ভাবরূপ থেকে শুরু করে গণসংগীতের কোরাস-আবেদন, তার সঙ্গে মিলেছে দেশি-বিদেশি যন্ত্রানুষঙ্গ– সিম্বাল-এর আওয়াজ, কুচকাওয়াজের চলন, পাখোয়াজের বোল, ক্ল্যারিয়োনেট, ফ্লুট আর পাশ্চাত্য ধাঁচের হারমোনির এফেক্ট। শুরুতেই 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণে, খানিক বিস্তারিত তানের ব্যবহারে ভৈরবীর চলন। অবরোহী গতিতে নেমে এসে, ওই পদটিকেই বার বার ধ্রুবপদের মত ব্যবহার করে চৌগুণ দ্রুতলয়ে পুনরাবৃত্তি– যেন দেশমাতার প্রভাতী মঙ্গলারতি আরম্ভ হল। 'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং' অংশেও সেই শক্তি-আরাধনার আনুষঙ্গিক আরতির ভাববাহী ছন্দ। এর মাঝে মাঝে সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্', 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি, যা অনেকটা গণনাট্য-সুলভ বৃন্দগানের উদ্দীপ্ত আবহ তৈরি করে। নিবিষ্ট শ্রোতা ভাবতেই পারেন, সুরকার যে এক সময় গণনাট্যের সাংস্কৃতিক মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এ যেন খানিকটা তারই প্রতিফলন। আবার গানের মাঝে মাঝে উঁচু পর্দায় ভেসে আসা 'মা' ডাকের জাদুকরী সুরব্যঞ্জনা– যার সামগ্রিক 'হারমোনাইজেশন' সেই সময়ের নিরিখে ভারতীয় চিত্রগীতির ধারায় একেবারেই ভিন্ন স্বাদের। পরে 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' ছবিতে শীর্ষসংগীত হিসেবে একেবারে নতুন করে এই গানের সুর দিয়েছিলেন হেমন্ত, তবে তা তেমন প্রচারিত নয়।

'আনন্দমঠ' ছবিতে 'বন্দে মাতরম্' গানটি ব্যবহৃত হয়েছে একাধিক বার, পুরুষকণ্ঠে এবং নারীকণ্ঠে। যখন নারীকণ্ঠে (লতা মঙ্গেশকর) গাওয়া হচ্ছে, তখন মাঝে মাঝে, বিশেষ করে শেষ স্তবকে 'মা' ডাকের নেপথ্যে পুরুষকণ্ঠে হামিং দিয়েছেন হেমন্ত, আবার পুরুষকণ্ঠে (হেমন্ত) গাইবার

সময় পশ্চাৎপটের আবহ তৈরি হয়েছে সমবেত কণ্ঠের হামিং-এ। 'বন্দে মাতরম্'-এর মত ঐতিহ্যবাহী গানে এ রকম পরীক্ষামূলক প্রয়োগ খানিকটা পশ্চিমি ছোঁয়া আনলেও, তা স্বদেশি ভাবাবেগের সঙ্গে আশ্চর্য রকম মিলে গিয়েছে।

'বন্দে মাতরম্'-এর তৃতীয় স্তবকে 'সপ্তকোটি-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ করালে' অংশে পাই আহির ভৈরোঁর ছোঁয়া, আবার গানের মধ্যবর্তী ইন্টারল্যুডে মালকোষের আমেজ। সকাল থেকে রাত্রি– ভারতীয় সংগীতের ধারায় সম্পূর্ণ একটি দিনের যাত্রাপথের ভাব ধরা পড়ছে একটি দেশভক্তিমূলক গানের নব রূপায়ণে। মার্গসংগীতের নির্দিষ্ট পথ থেকে বেরিয়ে এসে গানটি হয়ে উঠছে স্বতন্ত্র এক সাংগীতিক প্রকাশ– যার মধ্যে মিলে যাচ্ছে ধ্রুপদী, প্রগতিবাদী, আধুনিক, দেশি-বিদেশি উপাদান।

১৯৯৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের সময় এ আর রহমান একটি 'ফিউশন' গানে সুর করলেন, এবং সে গানটিও লতা মঙ্গেশকর গাইলেন। এর কথা, সুর, সংগীত আয়োজন নতুনভাবেই করা। কিন্তু তার মুখড়ার প্রথমেই তান, মাঝে মাঝে ব্যবহৃত 'রিফ্রেন' হিসেবে সুরকার 'বন্দে মাতরম্ বন্দে মাতরম্' ধুন আর সেই অবিস্মরণীয় 'মা' বলে 'পুকার' আঙ্গিকটি রেখে দিলেন এমনভাবে, যা সরাসরি ১৯৫২-র 'বন্দে মাতরম্'-এর সুরের আমেজ বয়ে আনে অমোঘ নস্ট্যালজিয়ার মত। এ যেন আধুনিক প্রজন্মের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন– পূর্ববর্তী সময়ের এক অবিস্মরণীয়, কালজয়ী সৃষ্টিকে।

২০০২ সালে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস-এর সমীক্ষা অনুসারে, সারা বিশ্বে ১৫৫টি দেশ থেকে সংগৃহীত, সবচেয়ে জনপ্রিয় ৭০০০ গানের মধ্যে প্রথম দশে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল 'আনন্দমঠ' ছায়াছবির এই 'বন্দে মাতরম্'। এই কম্পোজিশন এবার সত্তর বছরে, আর পঁচাত্তর পূর্ণ করতে চলেছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা। আবর্তন আর সমন্বয় যেমন সংগীতের ধর্ম, তেমন ইতিহাসেরও।

• সংগৃহীত

শ্রদ্ধাঞ্জলি//৪

গানটি লতা ধরলেন না, মাথা নিচু করে বসে, মুখ যখন তুললেন তাঁর চোখে জল

দেবজ্যোতি মিশ্র

সারি সারি গানের দল এসে নীরবে দাঁড়িয়েছে সেই নদীর পাড়ে, যে নদীর পাড়ে তারা শোক ও শ্রদ্ধায় বিদায় জানাবে তাদের উজ্জ্বলতম সঙ্গী ও সাথীটিকে। পথ পেরিয়ে নদী, নদী পেরিয়ে আগামীর আলোকবর্ষে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে আলো, এক বিস্ময়ঘোর। গানের ওপারে তখন নতুন ভোর। আগামীর পায়ে পায়ে পৌঁছতে হবে আরও দূরে, এ নদীর বাঁক পেরিয়ে অনন্ত নক্ষত্রবীথিতলে।

গানের সঙ্গে গানের কথা হয়, মুঠো খোলে আদিগন্ত হিমালয়। অফুরন্ত বাতাস বয়ে যায় গানের ছন্দ-দোলায়। আজ তারা সবাই প্রাণ মন ঢেলে সাজিয়ে দেবে তাদের জীবনধাত্রীকে। সময়ও আজ অশ্রুসজল। এ বিদায় বড় কঠিন বিদায়। তবুও এক মহাজীবন যে তাকে স্মরণ করছে সুরের আকুলি-বিকুলি মূর্ছনায় তাকে তো ধরণীর পথে পথে স্মৃতির কণায় কণায় গোটা ভারতবর্ষের অলিন্দ থেকে নিলয়ে উদ্ভাসিত হতে হবে। হয়তো এভাবেই চলে যেতে হয়। এই পৃথিবীর মায়া-স্মৃতি-প্রেম-প্রণয়, এই পৃথিবীর অভিমান-আদর-বিতৃষ্ণা-রাগ সব ফেলে চলে যাচ্ছেন আমাদের সম্রাজ্ঞী, না কি ভালবেসে আমরা তাঁকে বরণ করে নিচ্ছি মহাকালে। সুরের ভারতবর্ষ সংগীতের ভারতবর্ষ সাধারণ ও অসাধারণ সমস্ত ভারতবর্ষ আজ নতমুখে দাঁড়িয়ে...।

আমি তখন উনিশ কি কুড়ি, ঘোর লেগে গিয়েছিল গ্র্যান্ড হোটেলে একটি রিহার্সালে। বম্বে ও কলকাতার স্বনামধন্য প্রায় আশি-নব্বই জন মিউজিশিয়ানের মাঝে বসে সং ভায়োলিন বাজাচ্ছিলাম। অবশ্যই পাঠক বুঝে

নিতে পারেন, সলিল চৌধুরী নাইট হবে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। আজও মনে পড়ে, ঠিক পাশে বসেও আমি তাঁর কণ্ঠ শুনতে পাই না, কণ্ঠে যেন বাঁশি বেজে যায়। আমি হতভম্ব। অজান্তেই হঠাৎ ভায়োলিন থেমে গিয়েছে। আমি হাঁ করে সেই বিদ্যুৎ তরঙ্গিনীকে দেখছি, গোটা অর্কেস্ট্রা বেজে চলেছে, সলিলদা ডিরেক্ট করছেন। তিনি যে আমার বাজনা শুনছিলেন বুঝলাম, একটা ইশারায় বাজনা চালিয়ে যেতে বললেন। আমি কী এক অনাবিল ঘোর, কী এক মায়াবি নেশায় আবিষ্ট হয়ে বাজিয়ে চললাম একের পর এক।

দেখা কি হয় সে-সব মানুষদের সঙ্গে? তাঁদের আবির্ভাব ঘটে। আর তাঁরা একটা সাধারণ রক্তমাংসের শরীর ছেড়ে অনন্ত হয়ে যান। যাতে আমাদের সঙ্গে তাঁদের যুগ-যুগান্তর দেখাশোনা হতে পারে, কথা চালাচালি হতে পারে। সেই প্রথম দেখা মকবুল ফিদা হুসেনের সরস্বতী, যিনি দেবী কি ঈশ্বরী নন, জীবন্ত শরীরী এবং এক অনন্ত বিরহিণী রাধা। যিনি কণ্ঠে ধারণ করেছেন জীবনের গান। তা না হলে কি এত প্রেম, এত বিরহ, এত পূর্বরাগ, এত অভিসার অবলীলায় বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে পারতেন। আমি চুপ করে বসে সেই রাধারানিকে দেখছিলাম। লতা মঙ্গেশকরকে কেন্দ্র করে সলিল চৌধুরী নাইট, একের পর এক গান কখনও 'এ নদীর দুই কিনারে' কখনও 'আ যা রে পরদেসি' হয়ে 'না মন লাগে না' থেকে 'কেন কিছু কথা বলো না', এভাবেই 'না জানে কিউ' ছুঁয়ে আরও কত গানে আমাদের গ্র্যান্ড হোটেলের রিহার্সাল রুমকে মোহিত করে তুলেছেন। দেখেছিলাম প্রতিটা মিউজিশিয়ানের চোখে কী অসম্ভব শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। সেই প্রথম খুব কাছ থেকে শুনেছিলাম সলিলদার সঙ্গে তার প্রিয়তম শিল্পীর বাক্যালাপ। যা মনে হয়েছিল কৈশোরের প্রথম প্রেমে আবিষ্ট এক কিশোরীর দু'টি অবনত চোখ যেন না বলা কথা হয়ে ঝঙ্কার তোলে সুরে। খুব কাছাকাছি বসে থাকায় দু'জনের বাক্যালাপে আমি নিবিষ্ট ছিলাম। সলিলদাকে মনে হত এক ছায়াশীতল স্নেহপ্রশ্রয়। আমি অনুভব করেছিলাম দুই মহান শিল্পীর অনুচ্চারিত প্রেম।

রিহার্সালের শেষ প্রান্তে যখন 'রাতোঁ কি শায়র' গানটি শুরু হল, দেখলাম একটা ইন্টারল্যুড মিউজিকের পর আচমকা সব স্তব্ধ হয়ে গেল। কোনও এক অনিবার্য নৈঃশব্দ্য ঘিরে ধরল বিদ্যুৎ তরঙ্গিনীকে। গানটি লতা ধরলেন না। মাথা নিচু করে বসে আছেন শিল্পী। একটু দূরে সলিলদা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কিছু একটা কথা বলছেন। আমরা সবাই অবাক। একটু পরে যখন মুখ তুলে চাইলেন, খেয়াল করলাম তাঁর চোখে জল। সলিলদাকে ডাকলেন, পাশে বসে গানটি সঙ্গে গাইবার অনুরোধ করলেন। অন্তরা থেকে গান ধরলেন সলিলদা। আমরা মিউজিশিয়ানরা সাক্ষী হয়ে রইলাম এক মহৎ সংগীতকার ও এক বিস্ময়শিল্পীর যুগলবন্দির।

বহু পরে গল্পগাছায় শুনেছিলাম, যেহেতু সলিলদার ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল সংগীতে অগাধ পাণ্ডিত্য তাই সলিলদার জন্মদিনে লতা মঙ্গেশকর মোজার্ট, বেটোফেন এইসব পাশ্চাত্য কম্পোজারদের বই উপহার দিতেন। সলিলদার বাড়িতে সে-সব বই আমি দেখেছি। মুম্বই (তৎকালীন বম্বে) যাওয়ার পর নতুন এই সুরকারের কাছে লতা মঙ্গেশকর শিখেছিলেন অনেক, বিশেষত পাশ্চাত্য সংগীতের ধারাটি। আমরা যারা কলকাতার মিউজিশিয়ান একথা জানতাম, পুজোর গানের সময় যত এগিয়ে আসত, সলিলদার গানের খাতায় সবচেয়ে মনোগ্রাহী গানগুলো তোলা থাকত এই বিশেষ শিল্পীর জন্য। অদ্ভুত ব্যাপার, এ নিয়ে কারও কোনও আক্ষেপ ছিল না। থাকলেও তা জানতে পারিনি আমরা। এ যেন অবধারিত ছিল, এ যেন অনিবার্য ছিল।

কিছু বছর আগে তখন আমি মুম্বইয়ে। ১৯৯৫ সালে সেই ঝড়জলের রাতে সলিলদা যখন চলে গেলেন, আমি প্রথমবার পিতৃহারা হলাম। এরও বেশ কিছু বছর পরে আমি নিজে যখন চলচ্চিত্র-সংগীতে কাজ করছি, একটি ছবির কারণে আমার প্রযোজকের সঙ্গে লতা মঙ্গেশকরের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সলিল চৌধুরীর সঙ্গে দীর্ঘ তেরো বছর ছিলাম এই কথা জানার পর আমায় তিনি এমন কিছু কথা বলেছিলেন, যা হয়তো আজকে প্রচণ্ডভাবে প্রাসঙ্গিক।

ভারতবর্ষের অন্যান্য সংগীতকারদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন সলিল চৌধুরী ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতকার। তাঁর একটা আক্ষেপ থেকে গিয়েছে সলিল চৌধুরী কলকাতায় চলে আসার পর অনেকটা সময় তাঁদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল বলে। হয়তো প্রিয় সংগীতকারের জন্য কিছু করতে না পারার একটা অভিমান, একটা জমাটবাঁধা দুঃখ ছিল তাঁর মধ্যে।

আমি প্রচণ্ডভাবে সলিল অনুরাগী হয়েও বলব, একটি 'রয়না বিত যায়ে' একটি 'লগ যা গলে' কিংবা 'কাঁটো কে খিঁচকে ইয়ে আঁচল' এবং এরকম অসংখ্য গানের মায়া যিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁর সামনে মৃত্যুও বড় বিব্রত, অবিন্যস্ত হয়ে তাঁর পায়ের কাছে শোকে মুহ্যমান। আজ সেই মহানদীর পাড়ে বিসর্জনের সানাই বাজছে। অথচ মৃত্যু সে কি নিশ্চিন্ত। চপলা হরিণীর মত কিংবা এক অনন্ত মুগ্ধতার মাঝে আঁচল বিছিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর। প্রতিটা বিসর্জনই তো একটা নতুন যাত্রা। এ যাত্রা মহাকালের। এ যাত্রা না শেষ হওয়া মুগ্ধতার। তবুও মন মানে না। রজনী সত্যিই এখনও বাকি...।

দেবজ্যোতি মিশ্র ভারতের সংগীত পরিচালক

লতাজির সুরে গান লিখেছিলাম সেই অ্যালবাম ওঁর শেষ কাজ

দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী

সালটা ২০১৪। মরাঠি সংগীত পরিচালক ময়ূরেশ সতীশ পাই ফোন করে বললেন, 'লতাজি নতুন বাংলা গান করবেন। সলিল চৌধুরীর সম্মানে এই গান গাইবেন তিনি।' খুব অবাক হয়েছিলাম। প্রায় ২৫ বছর লতাজি বাংলায় গান রেকর্ড করেননি। কেউ অনুরোধ করলেও ফিরিয়ে দেন। সেই লতাজি নিজে গান গাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন! পরে জেনেছিলাম, সলিল চৌধুরীর জীবনাবসানের সময়ে লতা মঙ্গেশকর আসতে পারেননি। তাই তিনি ঠিক করেছিলেন, প্রয়াত সুরকারকে শ্রদ্ধা জানাবেন গান গেয়ে। সলিল-জায়া সবিতা চৌধুরীর কাছে সে সময়ে একটা অপ্রকাশিত কবিতা ছিল– 'মন দিয়ে আর ভাবি না তো, গান দিয়ে ভাবি।' লতা ঠিক করলেন, সেই গান গাইবেন। তখন ময়ূরেশ জানিয়েছিলেন যে, একটামাত্র গান দিয়ে রেকর্ড হবে না। আরও গান চাই। সেই আরও গানের প্রসঙ্গেই আমায় গান লেখার বরাত।

লতা মঙ্গেশকর শুনেছিলেন আমার নাম। জেনেছিলেন, আমি মান্না দে-র জন্য ৫০টা গান লিখেছি। এই তথ্য জানার পরে ময়ূরেশ আমায় যোগাযোগ করেন। বলেন, তিনটে গান লিখতে হবে। ওঁদের পছন্দ হল আমার লেখা। ঠিক হল, রেকর্ডে একটা গান সলিল চৌধুরীর আর তিনটে আমার লেখা থাকবে।

কাজ শুরু হল। এর মাঝে আবার ময়ূরেশের ফোন। লতাজির একটা সুর আছে, সেই সুরে একটা গান লিখতে হবে। আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে আমি আত্মহারা। আমি লতাজির সুরে গান লিখব! লিখলাম আমি সেই গান। যেন আপনা থেকেই বেরিয়ে এল– 'কী ব্যথা আছে একা মনে হয়তো বা সে কথা মনই জানে/ যে চাওয়া হল না পাওয়া কাঁদে কেন অভিমানে।' ইউটিউবে আনন্দঘন ছদ্মনামে বহু মরাঠি গান সুর করেছেন লতাজি। শুধু মরাঠি গান নয়, কিশোরকুমারের জন্যও সুর দিয়েছেন। একটা গান 'তারে আমি চোখে দেখেনি/ তার অনেক গল্প শুনেছি।' আর একটা গান ছিল, 'আমি নেই ভাবতেই ব্যথায় ব্যথায় মন ভরে যায়।' আবার ওই সময়ে কিশোরকুমারের সুরে লতাজি গেয়েছিলেন, 'ভালবাসার আগুন জ্বেলে কেন চলে যাই' আর 'কী লিখি তোমায়'।

আমি লেখা পাঠালাম লতাজিকে। ওঁর সুরের গান রেকর্ড করে পাঠালাম। আমায় ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি, ভয়ঙ্কর অসুস্থ। আমার লেখা গান আর সলিল চৌধুরীর কথায় লেখা গান রেকর্ড করলেন।

ওঁর তখন ৮৫ বছর বয়স। শিল্পী অসুস্থ, ভেবেছিলাম দেখা হবে না। মন খারাপ। তবু ওই অসুস্থ অবস্থায় তিনি দেখা করলেন! লতাজি বসে আছেন স্টুডিয়োর উঁচু চেয়ারে। আশা ভোঁসলে থেকে মান্না দে– সবার জন্য গান লিখেছি। কিন্তু ওই সাদা ধবধবে শাড়ি আর সবুজ ছোট ছোট ফুলের শাড়ি পরা মহিলার পাশে গিয়ে যখন বসলাম, মনে হল যেন দেবীর দেখা পেলাম! কী আলো ওঁর মুখে! ছেলের বিয়ের কার্ড দিলাম ওঁকে। ছেলের নাম অনুষ্টুপ দেখে বললেন, 'অনুষ্টুপ ছন্দের গান শুনেছো?' এমনই অনায়াস লতাজি। এমনই অসাধারণ সাধারণ!

জীবনের সবচেয়ে অবাক করা ঘটনাটাও ঘটেছিল সেদিনই। ওঁকে প্রণাম করতে গিয়ে আমার জামার পকেট থেকে কলমটা সোজা ওঁর পায়ে গিয়ে পড়ল! সাদা পাতা আর টাকাও তো ছিল জামার পকেটে। কিন্তু কলমটাই ওঁর পায়ের স্পর্শ পেল...আর লিখতে পারছি না। কান্না আসছে...

দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী ভারতের বিশিষ্ট গীতিকার

শ্রদ্ধাঞ্জলি//৫

‘বড্ড সরু গলা’

লতাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মুম্বইয়ের বাঙালি প্রযোজক

স্রবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যুর সামনে তিনি দাঁড়াতে পারতেন না। মায়ের মৃত্যুর দিনেও মায়ের পা জড়িয়ে ছিলেন। মায়ের চোখের দিকে তাকাতে পারেননি। ডাক্তারের কড়া নির্দেশ ছিল কোনও মৃতদেহের সামনে যেন তিনি না যান। তবুও গিয়েছিলেন তিনি। লতা মঙ্গেশকর। কিশোরকুমারের মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁর বাড়িতে। তারপর? প্রেশার তিনশো বাই একশো। অত্যন্ত স্পর্শকাতর মন। সরস্বতীর আলো! মৃত্যুকে সহ্য হবে কেন তাঁর? নাহ, শুধুই সরস্বতী নয়। ১৯২৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মারাঠি পরিবারে যখন লতা জন্মগ্রহণ করেন, তখন থেকেই মঙ্গেশকর পরিবারে লক্ষ্মী অচঞ্চলা। বাবা তাঁকে লক্ষ্মী বলেই ডাকতেন। বাবার নাম দীননাথ মঙ্গেশকর। নাট্য অভিনেতা ও গায়ক ছিলেন।

লতাকে প্রথম হেমা বলে ডাকা হত। আগের নাম হেমা থাকলেও, বাবার ‘ভাব বন্ধন’ নাটকের ‘লতিকা’র চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে হেমার নাম বদল করে রাখা হয় লতা। যে নাম পরে কিংবদন্তি হয়ে ওঠে। ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত একমাত্র মানুষ তিনি, জীবিত অবস্থায় যাঁর নামে পুরস্কার দেওয়া হত।

মুম্বইয়ের পেডার রোডের বাড়িতে, তিনটে ল্যান্ডলাইনের উপর ভিত্তি করেই বিশ্বসাথে যোগ রেখে গেছেন ভারতের সুরসম্রাজ্ঞী! কাজটাকেই নিজের ধ্যানজ্ঞান রেখেছিলেন। যে কাজ গান গাওয়া। তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি ‘মহল’-এর ‘আয়েগা আনেওয়ালার’ও তো সত্তর বছর পেরিয়ে গেল। গানের বাইরে কোনও কিছুতে জড়াননি তিনি। ছোটবেলা থেকেই জীবনযুদ্ধ। অর্থের তাগিদেই ছবিতে অভিনয় করতে হয়েছিল। ‘ফিল্মে অভিনয় তেরো বছর বয়সে। ওই মেকআপ আলো লোকজন গ্ল্যামার একদম ভাল লাগেনি আমার! তাই আর অভিনয় করার কথা ভাবিনি’– পরে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে অভিনয় প্রসঙ্গ এলে এ কথাই বলেছেন লতা।

জীবনে প্রথম যখন বাবার সঙ্গে মঞ্চে উঠেছিলেন তখন বয়স মাত্র নয়। বার বার বলেছেন, ‘বহুত তকলিফ উঠায়ি হ্যয় ম্যয়নে।’ পরে জীবনের মধ্যগগনে অবশ্য বুঝেছিলেন– মধ্যবিত্ত পরিবারের স্ট্রাগল তাঁকে লতা মঙ্গেশকর তৈরি করেছে। মাটি থেকে উঠে আসা আর মাটির সঙ্গে লেগে থাকা তারারাই সত্যিকারের আর্টিস্ট বলে মনে করতেন তিনি। তাঁর কাছে যেমন ছিল সচিন তেন্ডুলকর বা অমিতাভ বচ্চন। আকাশ ছুঁয়েও যাঁরা

মাটির কাছে থাকেন। লতাজির কথায় 'একদম সিম্পল'।

ছোটবেলা থেকেই লতা মঙ্গেশকরের অন্ধ ভক্ত সচিন তেন্ডুলকর। দেশে-বিদেশে সবসময়ই তাঁর সঙ্গী লতাজির গান। তাই নিজের বাড়ির মিউজিক রুমের জন্য লতা মঙ্গেশকরের ব্যবহার করা কোনও জিনিস চেয়েছিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। সচিনের ইচ্ছা মত, নিজের হাতের লেখা দু'টো গান মাস্টার ব্লাস্টারের হাতে তুলে দেন লতা।

বাবার নাটক লেখা, বাড়িতে গানের ক্লাস, লোকজন– এই সব দেখতে দেখতে তৈরি হয়েছেন লতা। প্রথমদিন স্কুলে গিয়েই অন্য বাচ্চাদের গান শিখিয়েছিলেন। সেই কারণে শিক্ষকের কাছে বকা খাওয়ায়, পরের দিন থেকে স্কুল যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি।

ইতিমধ্যে বাবার একটা নট্ট কোম্পানি ছিল সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁরা চলে আসেন পুণেতে। বাবাই ছিলেন পরিবারের বটবৃক্ষ। হঠাৎ সেই বাবা চলে গেলেন। লতা মাত্র তেরো। আছে আশা, ঊষা, মিনা আর হৃদয়নাথ। পুরো পরিবারের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে।

পয়সাও সংসারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ল। কাজে মনপ্রাণ বসিয়ে দিলেন লতা। নাহ, শোক আগলে বসে থাকেননি। মাঠে নামলেন লড়াই করতে। সাহায্য পেলেন বিনায়ক দামোদর কর্নাটকির, যিনি ছিলেন 'নবযুগ চিত্রপট' ফিল্ম কোম্পানির মালিক।

১৯৪২-এ মরাঠি ছবি 'কিতী হসাল'-এ প্রথম গান রেকর্ড করেন লতা। ১৯৪৫-এ 'নবযুগ চিত্রপট' মুম্বই পাড়ি দেয়। লতাজির প্রথম উপার্জন ছিল ২৫ টাকা। প্রথমবার মঞ্চে গাওয়ার জন্য লতা ওই ২৫ টাকা পান। হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীত শিখতে আরম্ভ করেন উস্তাদ আমন আলি খানের কাছে। বিনায়কের মৃত্যুর পর গুলাম হায়দার লতার দায়িত্ব নেন। তিনি লতাকে আলাপ করিয়ে দেন প্রযোজক শশধর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শশধর মুখোপাধ্যায় লতার গলার স্বর শুনে বলেছিলেন, 'বড্ড সরু গলা'। কিন্তু হায়দার জানতেন, এমন একদিন আসবে যখন সবাই এই লতার পায়ে পড়ে থাকবে গান রেকর্ডিং এর জন্য।

হায়দারের 'মজবুর' ছবিতে ১৯৪৮-এ গান রেকর্ড করেন লতা। এরপর আরও সুযোগ এলেও, তখনও সঙ্গে ছিল সমালোচনা। বলা হত নূরজাহানকে নকল করেন লতা। দিলীপ কুমার লতার উর্দু অ্যাকসেন্ট নিয়ে প্রশ্ন তোলেন! লতা জানতেন সমালোচনা শুনতে। উর্দু শিখতে আরম্ভ করেন তিনি। অবশেষে ১৯৪৯-এ হিট হয় 'আয়েগা আনেওয়ালা'। সেখান থেকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি।

পঞ্চাশের দশক থেকে আজ পর্যন্ত, বিশ্ব সংগীতের জমি লতার কণ্ঠকে জড়িয়ে আছে। অনিল বিশ্বাস থেকে শচীন দেববর্মণ, খৈয়াম, নৌসদ, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কল্যাণজি-আনন্দজি, রামচন্দ্রমের মতো অগুনতি পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেন লতা। তাঁর কণ্ঠ মাধুরীর নেশা ছড়াতে থাকে দেশময়, বিশ্বময়। শুধু হিন্দি ছবির গান নয়। গীত-গজল-ভজন 'অ্যায় মেরে ওয়াতেন কে লোগো'-র মত দেশাত্মবোধক গানে ভারতকে মনখারাপে ভিজিয়ে রাখেন তিনি। ষাটের দশকে লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের ঘরানায় লতার সুরবিহার দেশ রাগ কালকে ছাপিয়ে নিজস্ব ঘরানা তৈরি করে। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সাতশো গান রেকর্ড করেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের সঙ্গে। শোনা যায় লতাকে বিষ দিয়ে মারার চেষ্টাও হয়েছিল। তিন মাস অসুস্থ ছিলেন তিনি। তাঁর গলার রোম্যান্টিকতা আজও ভারতীয় রোম্যান্সের শেষ কথা।

যতীন মিশ্রর বই 'লতা সুরগাথা'তে লতাজি বলেছেন, 'প্রায়ই রেকর্ডিং করতে করতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়তাম আমি, আর ভীষণ খিদে পেত আমার। তখন রেকর্ডিং স্টুডিওতে ক্যান্টিন থাকত। নানা রকম খাবার পাওয়া যেত কি না, সে বিষয়ে আমার মনে নেই। তবে চা-বিস্কুট খুঁজে পাওয়া যেত তা বেশ মনে আছে। সারাদিনে এক কাপ চা আর দু-চারটে বিস্কুট খেয়েই কেটে যেত। এমনও দিন গেছে, যে দিন শুধু জল খেয়ে সারাদিন রেকর্ডিং করছি, কাজের ফাঁকে মনেই আসেনি যে ক্যান্টিনে গিয়ে কিছু খাবার খেয়ে আসতে পারি। সারাক্ষণ মাথায় এটাই ঘুরত– যেভাবে হোক নিজের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে হবে আমাকে।'

১৯৬২ সাল। ভারত-চিন যুদ্ধে লিপ্ত। জীবন বিসর্জন দিচ্ছেন সৈন্যরা। ১৯৬৩-তে লতা গাইলেন 'ইয়ে মেরে ওয়াতান কি লোগো' গানটি। তাঁর এই গান শুনে কেঁদেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু স্বয়ং। কণ্ঠ দিয়ে জাতিকে এক করে দিতে পারতেন তিনি! কার্গিলের যুদ্ধেও সেনাদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে বেজেছিল লতার সেই গান। আজও ভারতের মত ভিন্ন ভিন্ন ভাষার রাষ্ট্রে ২৬ জানুয়ারি মানে লতার এই গান!

১৯৭৮ সাল। ভারতের নাইটেঙ্গলকে নিয়ে ছবি করতে চেয়েছিলেন স্বয়ং রাজ কপূর। তাঁর মেয়ে ঋতু নন্দার বইতে উল্লেখ আছে সেই ঘটনার। লতা অভিনয় করেননি। গান গেয়েছিলেন 'সত্যম শিবম সুন্দরম'। শুধু হিন্দি নয়, আরও পঁয়ত্রিশটা ভাষায় অন্তত হাজার খানেক গান রেকর্ড করেছেন লতা। অভিনয়ের লোভ তাঁকে কাবু করতে পারেনি।

১৯৭৫ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস-এ ছ'হাজার মানুষের সামনে লতা মঙ্গেশকরকে প্রথম নিয়ে আসেন মুকেশ। লতার উপর মোহন দেওরা আর রচনা শাহ-র রচনা থেকে জানা যায়– খালি পায়ে, সাদা বেগুনি পাড়ের সাধারণ শাড়ি আর নিজের হাতে লেখা গানের কাগজ নিয়ে মঞ্চে এসেছিলেন লতা। যেন এক সাধারণ মেয়ে! ততদিনে হিন্দি ছবির তাবড় নায়িকাদের লিপে তাঁর গান। রেডিও, টেলিভিশনে ঝরে পড়ছে মুক্তদানার মত সুর। মান্না দে বলেছেন, 'যে যত ভালই গাক। লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে ঈশ্বর বাস করেন। ওর মত কেউ গাইতে পারবে না।' মান্নাদার সঙ্গে তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠতা এতটাই ছিল যে, মঙ্গেশকর পরিবার মান্না দে-কে বড়দাদার মত মানতেন।

নব্বইয়ের দশকে সিনেমার ক্যানভাস বদলালেও লতা রইলেন স্বমহিমায়। নদিম-শ্রবণ থেকে এ আর রহমান, তার আগে আর ডি বর্মণ– কেউ বাদ দেওয়ার স্পর্ধা দেখাননি লতাকে। প্রখ্যাত এই সংগীতশিল্পীকে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান অফিসার দে লা লিজিয়ঁ দ্য'নর প্রদান করেছিল সে দেশের সরকার।

কী এমন ধাতুতে তৈরি তিনি যে অসুস্থ হওয়ার আগের দিনও গান করেছেন? রাজ সিংহ দুঙ্গারপুর লতার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। উনি বলতেন, 'লতা গলার ব্যাপারে এত পারফেকশনিস্ট যে, ভালবাসলেও আইসক্রিম ছুঁয়ে দেখে না।' জানা যায়, ভরপেট খাওয়া বা আইসক্রিম কোনওটাই গলার জন্য খেতেন না লতা। শোনা যায় রাজ সিং দুঙ্গারপুরের সঙ্গে গভীর বন্ধুতার সুবাদেই লতা এত ক্রিকেটপাগল হয়ে উঠেছিলেন।

বাংলা ছিল তাঁর ভালবাসার জায়গা। কিশোরকুমার আর হেমন্তদা ছিলেন তাঁর রাখি ভাইয়া। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে যাবতীয় গসিপ উড়িয়ে দিয়েছিলেন সুরসম্রাজ্ঞী। হেমন্ত কন্যা রাণুকে নিজের হাতে সাধ খাইয়েছিলেন। বাংলায় বিবেকানন্দকে নিয়ে গান রেকর্ড করার প্রবল ইচ্ছে ছিল তাঁর। সরস্বতীর ইচ্ছেও বুঝি আটকে রাখে সময়! তা হলে কী পরজন্মে?

সলিল চৌধুরীর মৃত্যুতে দুঃখ পেয়ে বলেছিলেন 'সলিলদা যোগ্যতা অনুযায়ী কিছুই পেল না।' ভারতের সর্বকালের সেরা এই গায়িকা নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই ভালবাসতেন। পা অবধি লম্বা চুল! পা অবধি বিনুনি! হঠাৎ-ই কেউ দেখে ফেলতেন বাড়ি গেলে। খোঁপা, ঘোমটা, শাড়ি... আমিকে আগলে রাখার আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁর মধ্যে। এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'অমিতাভ বচ্চন বা সচিনকে কি চিৎকার করে বলতে হয় আমি অমিতাভ! আমি সচিন! আমায় দেখ!'

অনেকেই জানেন না, ছদ্মনামে গানের পরিচালনাও করেছেন তিনি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বার বার যখন 'আনন্দ ঘন' নামের কাউকে ডাকা হচ্ছিল, ডকুমেন্ট বলছিল তিনি এখানে উপস্থিত, কিন্তু কেউ পুরস্কার নিতে উঠছিল না স্টেজে। অবশেষে লতা উঠে পুরস্কার নেন। মারাঠি চলচ্চিত্রের রহস্যময় সংগীত পরিচালক আনন্দ ঘন-র রহস্য এভাবেই সবার সামনে আসে।

এক অখণ্ডধার রাগের আলাপ ধুন– এ সবের দেশ নেই। ভাষা নেই। তা বয়ে চলে কালের যাত্রায়। এই যাত্রার নাম লতা মঙ্গেশকর। নীরব আত্মার বিপ্লব। বিশ্ব সংগীতের সব জাতি তাঁর কাছে ঋণী। তিনিই পারেন শিল্প, দর্শন, চিত্রকলা, সিনেমা, নাটক, কবিতাকে তাঁর সুরে জাগিয়ে দিতে। এই ঋণ চুকিয়ে দেওয়ার নয়। যে সময়ে তিনি এসেছিলেন সেই সময়ের সমগ্র মানব সভ্যতা তাঁর ঋণ নত হয়ে স্বীকার করছে! লতা মঙ্গেশকর। এক নীরব আত্মা। সরস্বতী। সরস্বতীর সৎকার হয় না!

শ্রবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের সাংবাদিক

শ্রদ্ধাঞ্জলি//৬

লতা মঙ্গেশকর

আমি বাংলায় গান গাই

ড. মাহফুজ পারভেজ

ভারতের পশ্চিম উপকূলের মহারাষ্ট্রের মারাঠি মেয়েটি শুধু সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া নয়, তাবৎ পৃথিবী মাতিয়েছেন কিন্নরকণ্ঠের মোহনীয় মায়াজালের সুরেলা জাদুতে। লতা আর তার বোন আশার গানের তরঙ্গ তাদের জন্মস্থানের সুদূরবর্তী বাংলার ঘরে ঘরেও সমাদৃত। বাঙালি না হয়েও যেমন বাংলায় গান গেয়ে জনপ্রিয় হয়েছেন সুরসম্রাট মোহাম্মদ রফি, সুমন কল্যাণপুর, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, অলকা ইয়াগনিক, সাধনা সারগম এবং আরও বহু শিল্পী, তেমনই দৃষ্টান্ত রয়েছে সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের। উপমহাদেশে সুরসম্রাজ্ঞী রূপে সমকক্ষ ছিলেন মাত্র দুইজন, ভারতের লতা আর পাকিস্তানের নূরজাহান। লতা মঙ্গেশকরের মত বাংলা ও বাঙালির এত কাছে আসতে পারেননি অন্য কোনও অবাঙালি শিল্পী। শুরুটা সেই ১৯৪৮ সালে। বম্বেতে তখন নিজের পরিচিতি তৈরি করে নিয়েছেন বাঙালি পরিচালক শশধর মুখোপাধ্যায়।

সিনেমা পরিচালনা করছেন, আবার প্রযোজনার দায়িত্বও নিচ্ছেন। গোরেগাঁওয়ে তৈরি করেছেন 'ফিল্মিস্তান' নামের প্রসিদ্ধ স্টুডিও। বিখ্যাত লেখক সাদাত হাসন মান্টো, ইসমত চুঘতাই, অশোক কুমার– কে না নেই সেখানে! এমনই একটা সময় শশধরবাবুর কাছে হাজির হলেন নামজাদা সংগীত পরিচালক গোলাম হায়দার। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন বছর উনিশের এক তরুণীকে, মারাঠি পরিবারে জন্ম যার। ইতিমধ্যে বেশ কিছু মারাঠি ও হিন্দি সিনেমায় গান গেয়েছে মেয়েটি। গোলাম হায়দার মুগ্ধ হয়ে তরুণীকে নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন শশধর মুখোপাধ্যায়ের কাছে।

কিন্তু তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি সেদিন। শশধরবাবু কিছুতেই নিতে রাজি হননি মেয়েটিকে। তার বক্তব্য ছিল, 'গায়িকার গলা অত্যন্ত পাতলা। ফলে তিনি কাজ করতে পারবেন না।' এই কথা শুনে রীতিমতো রেগে যান গোলাম হায়দার। প্রায় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসেন সেদিন। তিনি জানতেন, এই মেয়ে সবার মন জয় করতে এসেছে। একদিন এমন হবে যে, পরিচালকরা তার বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। পৃথিবীজোড়া নাম হবে তার। গোলাম হায়দার খাঁটি জহুরি ছিলেন, হীরে চিনতে ভুল করেননি। সেদিনের উনিশ বছরের সেই মেয়েটির নাম লতা মঙ্গেশকর।

এরপর ১৯৪৮ সালেই তৈরি হয় 'মজবুর' সিনেমাটি। লতার সেই 'পাতলা গলা'ই গেয়ে ওঠে 'দিল মেরা তোড়া, মুঝে কাহি কা না ছোড়া'। তারপর ইতিহাস এক কিংবদন্তির বেড়ে ওঠার সাক্ষী থাকল। লতা মঙ্গেশকর নিজেই এক চলমান ইতিহাসে পরিণত হন, যিনি কলম দিয়ে বা যুদ্ধ করে নয়, নিজের গলা দিয়ে, সুর দিয়ে, সৃষ্টির সাধিকা হয়ে সবাইকে ভাসিয়েছেন সুরের অমৃতলোকে।

লতা ছিলেন সত্যিকার অর্থেই সাধক। নিজেই বলেছেন, তার জীবন বুঝতে গেলে তার সাধনাকে বুঝতে হবে, শুনতে হবে। সংগীত নিয়েই মেতে ছিলেন জীবনভর। সংগীতের সুরসুধা বিলিয়ে দিয়েছেন আজীবন। নব্বই বছর পেরিয়েও তিনি ছিলেন সুরের চিরতরুণ উপমা।

যদিও গানের জগতে পা দেওয়ার পর প্রথমদিকে এক বাঙালি পরিচালকই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তথাপি লতা বাংলা গান গেয়েছেন গলা খুলে। বাংলার সঙ্গে চিরকালের মতো সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল লতার। সুরে সুরে বম্বে আর বাংলার মধ্যে তৈরি করেন তিনি সুরের সাঁকো।

কবে প্রথম কোন্ বাংলা ছবিতে লতা প্লেব্যাক করেন, তা নিয়ে বেশ কিছু তর্ক রয়েছে। তবে মনে করা হয়, ১৯৫৬ সালে 'অসমাপ্ত' ছবি দিয়েই তাঁর বাংলা গানের জগতে পদার্পণ ঘটে, যাতে দুটি গান গেয়েছিলেন তিনি। তারপর একের পর এক কালজয়ী বাংলা গান করেন লতা। কখনও সলিল চৌধুরী, শচীন দেববর্মণ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কখনও আবার রাহুল দেববর্মণ, বাপী লাহিড়ির সুরে মাতিয়ে দিয়েছেন বাংলার সংগীত জগত।

লতা জন্মগতভাবে বাঙালি ছিলেন না, বাংলাও বুঝতেন না। কিন্তু ভাষাটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। একটা ভাষায় গান গাইতে গেলে সেই ভাষা না জানলেও সে ভাষাকে অনুভবের সামর্থ্য থাকতেই হয়। তা না হলে গানটাকেই ছোঁয়া যায় না। এজন্য, শুধু বাংলা শিখবেন বলে বাড়িতে শিক্ষক রেখেছিলেন লতা মঙ্গেশকর। শিক্ষক হয়েছিলেন বাসু ভট্টাচার্য। দায়সারাভাবে নয়, রীতিমত লিখতে ও পড়তে যাতে পারেন সেই চেষ্টাই করেছিলেন তিনি। একজন শিল্পীর কত বড় সাধনার শক্তি থাকলে এমন দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, লতা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ ছিলেন।

লতা তার পেশাজীবনের মধ্যগগনে দেখেছিলেন, উপমহাদেশের শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও চলচ্চিত্রে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি এবং বাঙালি পরিচালক-সুরকারদের জয়জয়কার। ব্যক্তিগত জীবনে লতা মঙ্গেশকরও জড়িয়ে গিয়েছিলেন বাঙালি পরিবারের সঙ্গে। সেইসূত্রেই পরিচয় হয়েছিল প্রবাদপ্রতিম শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। একসময় দুই পরিবারের মধ্যেও ভাল সম্পর্ক হয়ে যায়।

লতার কাছে ঠিক কতটা আপন ছিলেন 'হেমন্তদা', সেটা বেশ কিছু ঘটনা থেকেই জানা যায়। যেমন, ১৯৫১ সালে পরিচালক হেমেন গুপ্ত বম্বেতে ডেকে পাঠালেন হেমন্তকে। তার ইচ্ছে, পরবর্তী সিনেমা 'আনন্দমঠ'-এর সুরের দায়িত্বে থাকবেন তিনি। বাংলায় কাজকর্ম মিটিয়ে বম্বে চলে গেলেন হেমন্ত। হাজির হলেন ফিল্মিস্তান স্টুডিওতে। শশধর মুখোপাধ্যায় তাকে সংগীত পরিচালকের চাকরি দিলেন। 'বন্দে মাতরম' গানটা তিনি গাওয়াবেন লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে। শশধরবাবুকে বলতেই

তিনি বললেন, লতা হয়তো আসবেন না। পুরনো কথা মনে পড়ে গিয়েছিল তার?

এদিকে হেমন্ত ঠিক করে ফেলেছেন, এই গান লতা ছাড়া কারোর গলায় গাওয়াবেন না। তাই একবার চেষ্টা করে দেখতে চাইলেন তিনি। শশধর মুখোপাধ্যায় নিমরাজি হলেন। লতা মঙ্গেশকরের কাছে যাওয়ার পর তিনি একটাই কথা বললেন। 'আমি ওখানে গাইব না ঠিক করেছি, কিন্তু শুধু আপনার জন্যই গাইব'। আর টাকা? না, লতার টাকা চাই না। তিনি শুধু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করতে চান। এমনকি, রিহার্সাল দিতে সটান চলে গেলেন হেমন্তর বাড়ি, যা ছিল লতার স্বভাববিরুদ্ধ। জাতশিল্পী লতার এমনই গভীরতর ছিল সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবিক স্পর্শকাতরতা।

বাংলা ও বাঙালির সঙ্গে লতার সম্পর্ক এখানেই থেমে থাকেনি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রাণু তখন অন্তঃসত্ত্বা। লতা মঙ্গেশকর তার প্রাণের ভ্রাতুষ্পুত্রী। এসময় বাঙালিদের মধ্যে 'সাধ' খাওয়ানোর রীতি থাকে। লতা নিজেই দায়িত্ব নিয়ে সেই কাজটি করলেন। হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন স্নেহের রাণুকে।

কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সেই হেমন্ত-সন্ধ্যার কথা কেউ ভুলতে পারবে না। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সংগীতজীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। খানিক ইতস্তত করেই লতাকে ফোন করেছিলেন হেমন্ত। যদি আসতে পারেন। ফোনের ওপাশ থেকে নিজেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন সুরের রানি। তাঁর 'হেমন্তদা'র গানের পঞ্চাশ বছর পূর্তি, আর তিনি আসবেন না, তা কি হয়! অনুষ্ঠানের তিনদিন আগে প্রবল শরীর খারাপ লতার। হয়তো আসতেনই না। কিন্তু ওই যে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠান বলে কথা। লতা না এসে থাকতে পারেননি।

গান তাকে ছুটিয়ে নিয়েছে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে। মৃত্যুর অনন্তনিদ্রায় চলে গিয়েও তিনি রেখে গেছেন হাজার হাজার গানে গুঞ্জরিত কথামালা, যা সুর-ঝঙ্কারে মনে করায় এক অসাধারণ শিল্পীকে, যিনি বাংলাকে ভালবেসে ছিলেন, বাংলায় গান গেয়েছিলেন, হৃদয় দিয়ে।

ড. মাহফুজ পারভেজ
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

সাক্ষাৎকার

‘একটি জীবনই যথেষ্ট’

শেষ সাক্ষাৎকারে লতা মঙ্গেশকর

সদ্য প্রয়াত কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের সাক্ষাৎকার অনেকবার নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে ভারতীয় সাংবাদিক খালিদ মোহাম্মদের। তবে শেষ সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনের নানা অজানা দিক খোলাখুলিভাবে তুলে ধরেছেন লতা। দুই বছর আগে এ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন খালিদ, ল্যান্ডফোনে দুই পর্বে। খালিদ বলেছেন, এই বয়সেও লতার কণ্ঠস্বর ছিল বরাবরের মতই রেশমমসৃণ। ৬ ফেব্রুয়ারি (২০২২) ভারতীয় সংবাদমাধ্যম *দ্য কুইন্ট*-এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হল।

খালিদ মোহাম্মদ: আপনি কি আপনার গত সাত দশকের অর্জনগুলোর দিকে কখনও ফিরে তাকিয়েছেন? সেখানে কি বেদনাদায়ক কিছু আছে? কোনও অপূর্ণ ইচ্ছা? কোনও তৃপ্তির অনুভূতি?

লতা মঙ্গেশকর: আমি খুব বেশি চিন্তাভাবনার মানুষ বলে নিজেকে বিবেচনা করি না। অতীতে বাস করে লাভ নেই। আত্মপ্রেমী মানুষই কেবল আজ ও আগামীকালকে উপেক্ষা করে অতীত নিয়ে পড়ে থাকেন। যতদিন আমার কণ্ঠস্বর আমাকে ছেড়ে না যাচ্ছে, ততদিন আমি গান গেয়ে যেতে চাই। গানই একমাত্র বিষয়, যা আমি পারি।

খালিদ: আপনি কি পাকিস্তানি চলচ্চিত্রের গায়িকা নূরজাহানের গায়কিতে প্রভাবিত হয়েছিলেন?
লতা: হ্যাঁ, আমাকে তাঁর সঙ্গে তুলনা করা হত। আমি স্বীকারও করব যে, তাঁর গান শোনার পর তাঁর গায়কি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।

খালিদ: আপনি কি আপনার গানের সংগ্রহ ডিজিটাইজ করে সংরক্ষণ করেছেন?
লতা: আমি আমার সব ভিনাইল রেকর্ড, ক্যাসেট আর সিডি সংরক্ষণ করেছি, সংগীত কোম্পানিগুলো আমাদের কাছে

যেগুলো পাঠায়। বাড়িতে কিছু রাখার মত আর এক ইঞ্চি জায়গাও বাকি নেই। আমার নাতি-ভাতিজা ও নাতনি-ভাতিজিরা আমার সংগ্রহশালাটি ডিজিটাইজ করতে পারে। আমি অবশ্য ওদের কিছু বলিনি।

খালিদ: আপনি ঠিক কী নিয়ে হতাশাগ্রস্ত হন?
লতা: ওহ, একেবারে ছোটখাটো জিনিস নিয়ে, যার ফলাফল তেমন কিছুই না।

খালিদ: ১৯৭০-এর দশকে লতা মঙ্গেশকরের একচেটিয়া প্রভাব নিয়ে একটি বিতর্ক তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল। বিষয়টি আপনার জন্য বেদনাদায়ক ছিল?
লতা: আমি সহজে আহত হই না। দেখুন, এ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট বিচক্ষণতা আছে যে, একটি ইন্ডাস্ট্রি– যা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্র তৈরি করে– তার সবগুলো গান আমাকে দেওয়া উচিত বলে বোধ হয় আমি জবরদস্তি করতে পারি না।

খালিদ: দশক ধরে লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে আশা ভোঁসলের অনুচ্চারিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে হরদম কথাবার্তা চলেছে।
লতা: দেখুন, কিছু লোক তাঁদের মজ্জাগতভাবেই বিতর্ক উসকে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, লতা অমুক-অমুক গান আশার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। অথবা তার উল্টো। ঘটনা হল, আমি ক্যাবারে গানগুলো না করে দিতাম। ওগুলো স্বাভাবিকভাবেই আশার কাছে চলে যেত।

খালিদ: আপনি কি কখনও রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছেন?
লতা: কক্ষনও না। রাজনীতিতে আমার সুদূর আগ্রহও নেই। ১৯৯৯ সাল থেকে আমি ছয় বছর রাজ্যসভার সদস্য ছিলাম, কিন্তু একটি কথাও বলিনি। আমি চুপ করে ছিলাম। রাজনীতির সঙ্গে সংগীতের দূরত্ব ঠিক ততটাই, যতটা আসমানের সঙ্গে জমিনের দূরত্ব। সংগীত আসে একটি কোমল হৃদয় থেকে। রাজনীতির জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতার প্রয়োজন হয়। আমাকে প্রায়ই নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে বলা হয়েছে। আমি বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছি। রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার সম্মান গ্রহণ করাটা আমার ব্যক্তিগত আগ্রহের বিষয় ছিল না। অবিরাম বাক্যালাপের পর আমার পক্ষে আর প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয়নি। রাজ্যসভার অধিবেশনে অনিয়মিত আর নিশ্চুপ থাকার জন্য অভিনেত্রী শাবানা আজমি আমার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। আমি তাঁর সমালোচনার জবাব দিইনি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর, আমারটা আমার। তাই এখনও শাবানা আর আমার দেখা হলে আমরা খুবই আন্তরিক থাকি।

খালিদ: আপনি সংসদের কার্যধারায় কি বিমোহিত ছিলেন?
লতা: আমি গোবেচারা মুখ করে বসে থাকতাম। বিতর্ক ও আলোচনা, মতামত ও বিপরীত মতামতকে সম্মান জানানো উচিত।

খালিদ: আপনি টুইটার বেছে নিয়েছিলেন। আপনার কি ট্রলের ঝুঁকি নেই?
লতা: আমি বেশ সতর্ক। আমি এমন কোনও বিষয়ে বলি না, যা আমার জানাবোঝার বাইরে। আমি যা করি, তা হল জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানো। বড়ে গুলাম আলী খানের মতো মানুষের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণ করি।

খালিদ: আপনার কি কোনও শত্রু আছে?
লতা: মানে?

খালিদ: যাঁরা আপনার প্রতি ক্ষুব্ধ?
লতা: আমি নিশ্চিত, কেউ কেউ নিশ্চয়ই আছে। তবে প্রকাশ্যে কেউ নয়। হয়তো তারা তাদের ক্ষোভের পেছনে যুক্তি দিতে পারে না।

খালিদ: কে আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধু?
লতা: রচনা শাহ, আমার ভাইঝি, মীনার মেয়ে। আমি তাকে আমার বন্ধু, আমার বিশ্বস্তজন মনে করি।

খালিদ: আপনার বিবেচনায় কোন্‌টি আপনার সবচেয়ে আন্ডাররেটেড গান?
লতা: আপনি সম্ভবত বলতে চাইছেন কোনও গান যতটা জনপ্রিয় হতে পারত, ততটা হতে পারেনি। বেশ কয়েকটা গান। আমি মায়া মেমসাব-এর (১৯৯৩) জন্য হৃদয়নাথের সুর করা 'এক হাসিনা নিগাহ কা' গানটার কথা বলব। গানটার দুটি সংস্করণ ছিল। একটি কুমার সানুর, আরেকটা আমার। হৃদয়নাথের কম্পোজিশনগুলো প্রায় লেকিন (১৯৯০) সিনেমার গানের মতোই বেশ জটিল। 'ইয়ারা সিলি সিলি' জনপ্রিয় হয়েছে, অথচ একই ছবির 'সুনিয়ো জি আরজ মারিয়ো'ও কার্যকর করা একটি চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল।

খালিদ: আপনি অবিবাহিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কখনও কি একাকী বোধ করেন?
লতা: আমার মা আমাকে বিয়ে করার জন্য খালি জ্বালাতন করতেন। অবশেষে আমাকে ছেড়ে দিলেন। আমার পরিবার মানে বিয়ের চেয়ে অনেক বেশি কিছু। মাঝেমধ্যে একাকী বোধ না করলে আমি মানুষ হতে পারতাম না। বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত, আমরা সবাই একাকীত্বে ভুগি। একা থাকা ক্ষতিকর হতে পারে। ভাগ্যক্রমে আমি, প্রিয়জনেরা সব সময় আমাকে ঘিরে রাখে।

খালিদ: আপনি কি কখনও প্রেমে পড়েছেন?
লতা: শুধু আমার কাজের সঙ্গে। আমি আমার একান্ত আপনজন, আমার পরিবারকে ভালবাসি। এ ছাড়া আর কিছুকে নয়, কাউকে নয়।

খালিদ: আপনাকে একটি ইচ্ছা করতে বলা হলে আপনি কী চাইবেন?
লতা: আমি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি। তবু একবার চলে গেলে আমি সত্যিই আবার জন্ম নিতে চাই না। স্রষ্টা আমাকে পুনর্জন্ম না দিলেই ভাল। একটি জীবনই যথেষ্ট। ইংরেজি থেকে অনুবাদ সাইফুল সামিন

কবিতা

খোরশের বাহারের কবিতা

স্বর্ণাভ তরল

আমি বসে থাকি
কাচের দরজায় ছায়া পড়ে না
আমি বসে থাকি
চেনা রিংটোন বাজে না
আমি বসে থাকি
ঘড়ির কাঁটা থেমে থাকে না
আমি বসে থাকি
স্বর্ণাভ তরল একটুও কমে না।

আমি উঠে দাঁড়াই
মোবাইলে অচেনা সুর বাজে
ভ্রুক্ষেপ করি না
আমি মৃদু পায়চারি করি
সোফাতে পিওন ঝিমোতে থাকে।

আমি অকারণে আয়নার কাছে যাই
দু'চোখের নিচে মাসাজ করি
সিগ্রেটের শলায় আগুন জ্বালি
ছোট্ট ছোট্ট ধোঁয়ায় রিং নিয়ে খেলি
কলিং বেল টিপে পিওনকে জাগিয়ে রাখি
বিরহী এ সন্ধ্যায় কেউ ফিরে না যায়।
ফ্রিজের দরজা খুলে বীয়ারের শীতলতা দেখি
গ্রীবাতে তার গরম নিঃশ্বাস অনুভূত হয় না, সব অনুভূতি ঠিক হয় না
সে আর আসে না।

আমি টেবিলে মাথা রেখে ঝিমোতে থাকি
হঠাৎ দেখি চিরচেনা ঢং-এ
কাঠের চেয়ারে সে বসে আছে বিমর্ষ।

আমি দ্রুত তার চিবুকে হাতের পরশ বুলাই
তারপর অনেকটা সময়
নিমেষে মিলিয়ে যায়
আবার শূন্যে ভাসতে ভাসতে
স্বর্ণাভ তরলের মত
ভোরের শিশির হয়ে মরতে থাকি।

ঘর আর পর

সন্ধ্যা উতরে এখন বেশ রাত
রাস্তায় আলোর ঝলকানি যেমন বেড়েছে
তেমনি কমে এসেছে ট্রাফিকের কোলাহল।
ব্যস্ত দিনের শেষে প্রতিদিনের মত
ঘরে ফেরা।

আজ কারও সাথে কথা হয়নি
অনেক কথা উঁকিঝুঁকি মারছে
তেলাপোকার মতো সমস্ত বুকের
উঠোন জুড়ে
কথাগুলো কেমন দৌড়াচ্ছে কেবল।

হাঁটতে হাঁটতে তিন রাস্তার মোড়ে এসে
ভাবতে থাকি, কী এমন কথা?
নাহ, তেমন কিছুই নয়। না প্রেম
না ভালবাসা, না সংসার, না আপন
না স্নিগ্ধতা, না বিমুগ্ধতা
তবুও কিসের আঁচড়ানি বুকে মোচড়
তোলে।
ঘরেই ফিরে চলি
কে আছে আর এমন আপন
যাকে বুক খুলে সব দেখিয়ে বলি
দেখোতো, তেলাপোকাটা বুকের ঠিক
কোনখানে?

সাইন্সল্যাব মোড়ে রিক্সাকে ইউটার্ন
নিতে বলি
হালকা বাতাস লাগে শরীরে
বেশ চনমনে, বেশ উচ্ছল, বেশ প্রাণবন্ত
বাতাসের সাথে কথা বলি,
কথা বলি দোকানের নিয়ন বোর্ডের সাথে
স্ট্রিট লাইটের সাথে, তার সাথে
কথা বলি, যাব যার কাছে।

অবশেষে ফিরে আসি, ঘরে নয়
রইল পড়ে ঘর
চিরচেনা পর, বাড়ায় দু'হাত
চিবুকে হাত রেখে বলেছে সে,
এতটা দেরিতে এলে, এতটা অন্ধকারে
এতটুকু পথ!
শুধু বলেছিলাম, একটা সিগ্রেট হবে,
দেশলাই।

অতীত থেকে অনাদিকাল

বিবাগী এ সন্ধ্যায়
ঘরের সবগুলো বাতি জ্বেলে বসে আছি।
থই থই আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে
চারদিক–
তবুও সামনে সোফার নিচে
জমাট কালো অন্ধকারে চোখ আঁটকে যায়।

ডিজিটাল এ যুগে সবই সম্ভব
মনে হয়, নিজেকে ক্লোন করে স্ক্যান করে
কেউ লুকিয়ে আছে ওখানে
পরম সানুগ্রহে আমাকে সঙ্গ দিচ্ছে
আমার উৎসুক মনে তাই ভয় জাগে না।

কে ওখানে?
সশব্দে চারদিক সচকিত করি
পিওন দরজা খুলে জানতে চায়
বললাম, নাহ্, কিছু না।
সে চলে গেল...
কিন্তু ধ্রুপদ বেরিয়ে উঁকি দিচ্ছে
আমার সাথে লুকোচুরি খেলছে

বলি তাকে, তোমার কষ্ট হয় না ধ্রুপদ?
ক্ষুধা লাগে না?
মাকে দেখতে ইচ্ছে করে না?
কতদিন আর এমন করে পালিয়ে বেড়াবে?

ধ্রুপদ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে
নিজের নিত্য স্থির অস্তিত্বের কথা
জানিয়ে বলে,
আমি তো সারাক্ষণ জুড়ে থাকি
মায়ের কোল
প্রথম ভ্রূণের মত
তুমিই কেবল পালিয়ে বেড়াও

তারপর ঘরময় ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ
গোঙরানির শব্দে সব বাতি নিভে আসে
আমার চোখে নিরন্তর জলের ধারা বয়
আমরা অন্ধকারে বিলীন হই
ইচ্ছে করে ধ্রুপদের মত
নিজেকে ক্লোন করে স্ক্যানড্ হয়ে
পালিয়ে বেড়াই
অতীত থেকে অনাদিকাল।

ফিরোজ খানের কবিতা

অনুভবে অস্তিত্ব

দ্বীপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে হল
চরাচরে কেউ নেই। কেবল চারপাশ
নড়ে চড়ে বলল– আমি আছি!
সেই অস্ফুট উচ্চারণ– আমি আছি!
সামনে কেউ নেই, পেছনেও নয়।
তবু এ কোন্ 'আমি' ডাকে!
নিশি ডাকে, কিংবা হলদে আলোর সকাল
নিঃশব্দ চারপাশ, তবু কত পদশব্দ শুনি
দেখা নেই কারও, অদৃশ্যদের রাজত্ব আজ

ফিস ফিস করে বাতাস বলে
গাছের পাতারা সবুজ বিনুনী দুলিয়ে বলে
আর বলে ঘাস ফড়িং অথবা জলের মাছ
কালো কোকিলের পুচ্ছে থাকে হঠাৎ গতি
সমস্বরে অনুচ্চ উচ্চারণে সবাই বলে
– আমি আছি!

'আমি'কে দেখিনি বহুদিন
ফেরারী জীবনে সে পলাতক
দ্বীপের তীরে নেমে মনে হল– সে আছে।
তাকে দেখার ইচ্ছেয় জলের কিনারে যাই
সে থাকে ঢেউয়ে, আকাশের নীলে
কিংবা গাঙচিলের সাদা ডানায়।

একা একা করে কত নির্জনতা নিয়ে
বিভোর মানুষ
একা কি সে একবারও!
সুর ও বেসুর যমজের মত সহোদর
আমি নিঃশেষ বহুতে।

কবি

কবির শরম নেই
নির্লজ্জভাবে সত্য প্রিয় সে
কবির কবিতা কুসুম কল্পনা নয়
অন্তর্গত বোধ থেকে উৎসারিত
বেগবান ফল্গুধারা।
মিথ্যার অংশটুকু বাদ দিলে
তবেই কবিতা, কবিতা হয়ে ওঠে।

সেই অর্থে
'সকলেই কবি নয়'
যার কবিতা স্তুতি ও লেহন স্বার্থ দিয়ে মোড়া
সে নয় কবি।
কবির দহন, দর্শন
সুদূর দেখতে পারার মন
ভয়ংকর ও নিষ্ঠুরতায় তার সত্য
উন্মোচিত হয় এক বাক্যে।

কবি নিজে একার নয়
সমগ্রতায় ও সত্যে সে প্রকাশিত।

ভাসানচর

সাগর জলে আমি ভেসে যাই,
যে দ্বীপে যায়নি কেউ আগে
অনাঘ্রাত কুসুমের মত
সাগরকন্যা, আমি ডুবতে যাই তোমার কাছে।
ঝিঁঝির ডাকে নেশার মত চাঁদের আলোয়
কোকিলকণ্ঠী, তোমার বুকের
কালো তিলে হারিয়ে যাই।

কুয়াশায় ভেজা স্বপ্ন আলোয়
ঝলসে ওঠে রূপের থালা
বক্র গ্রীবায় একটি চুমু খাই
ও সাগর কন্যা রে!

নিঝুম রাতে সেজেছে আজ সাগর
দ্বীপের ভেতর
তারই তীরে তোমার বাসর
শূন্যে দেখা পাই, কোকিলকণ্ঠী।

দোদুল দোলে অঙ্গ শোভা
নৃত্যরত চম্পকে বিদ্যুৎ
পায়ের নূপুর বাজায় বেজায় নিক্কন
অথৈ জলে কেবলি ডোবা
সাগর জলে ভেসে যাই
ডুবতে ডুবতে ভালবাসায় চেতনা ফিরে পাই।

ভালবাসা দিতে দিতে... পেতে পেতে...
সুখে কাতর নম্র মুখখানি
দু'হাতে ধরে চুমু খাই।

অথচ তাকিয়ে দেখ একবার
ঘরহারা সম্বলহীন উচ্ছিষ্ট জীবন
দ্বীপের কোলজুড়ে কেবল বিষণ্নতা ছড়ায়
বঙ্গোপসাগরের এই তীরে
বেদনায় ঝিঁঝির ডাকে এবং চাঁদের
আলোকে ছাড়িয়ে
রোহিঙ্গারা কালো আকাশের ছায়া হয়ে আছে।

এখন বিন্দুতে স্থির হয়েছে চাওয়া

জীবনের প্রার্থনা কত শত
আনত জমিনের ভেতর। আকাশের দিকে চেয়ে
প্রার্থনায় রত মানুষ
কত কিছু যে তার চাই; যৌবন কেবল প্রার্থনার!

কত ছোটাছুটি, কত আশা কত ভালবাসা
সকলই ফুরায় দিন শেষে।
জমিনের এই জীবন প্রার্থনা ও সংগ্রামের
নিজের কাছে ফেরত আসা অবশেষে।

বিরাশিতে এসে এখন বিন্দুতে
স্থির হয়েছে চাওয়া
সুস্থতায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারা।

ফুল ফুটুক না ফুটুক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে–
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে–
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।

গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত
– তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।

লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এইসব সাত-পাঁচ ভাবছিল–

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!

তারপর দাড়ম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।
অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখন ও হাসছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
ভারতের বিখ্যাত কবি

শ্রদ্ধাঞ্জলি//৭

আধুনিক বাংলা গানের শেষ প্রতিনিধির বিদায়

ঋতপ্রভ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা অভিনয়ের জগৎ যেমন সাবালক হয়েছিল উত্তম-সুচিত্রা জুটির হাত ধরে, তেমনই বাংলা গান, বিশেষ করে বাংলা আধুনিক এবং ফিল্মের গান সাবালকত্ব লাভ করেছিল হেমন্ত-সন্ধ্যা বা মান্না-সন্ধ্যা জুটির সৌজন্যে। গানকে আধুনিক রূপ দিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা মান্না দে যে কাজটি করেছেন, নারী কণ্ঠে সেই কাজের সূচনা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে। যে কারণে এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলা সংগীতে মহিলা কণ্ঠের আধুনিকতার মূর্ত প্রতীক সন্ধ্যা। এতদিন যিনি ছিলেন সেই ইতিহাসের জীবন্ত দলিল হয়ে। দীর্ঘদিনই জনসমক্ষে গান করতেন না। তথাপি ছিলেন সংগীত জগতের যুগ পরিবর্তনের এক সত্যদ্রষ্টা শিল্পী হিসেবে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ সুতরাং আক্ষরিক অর্থেই যুগাবসান।

একই সঙ্গে শাস্ত্রীয়সংগীত, লঘু শাস্ত্রীয় সংগীত, আধুনিক গান, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসংগীত এবং সেই সঙ্গে মুম্বইয়ে হিন্দি চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক– এত দীর্ঘ সময় ধরে বাংলার কোনও শিল্পীর সঞ্চারপথ এত ব্যাপক নয়। এ কথা সকলেরই জানা যে, প্রত্যেক সংগীতের গায়নশৈলী ভিন্ন। সন্ধ্যার বড় কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রত্যেকটি শৈলীর গান আপন ভাব অক্ষুণ্ন রেখে নিবেদন করা। যে কারণে ‘এ শুধু গানের দিন’, ‘আমি যে জলসাঘরে’-র মত ফিল্মের

‘সাংস্কৃতিক জগৎ আরও শূন্য হল!’ প্রধানমন্ত্রীর টুইট

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ মঙ্গলবার রাত ১১টা নাগাদ এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী লেখেন, ‘গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে আমরা মর্মাহত। আমাদের সাংস্কৃতিক জগৎ এখন আরও দীন হল। ওঁর সুরেলা কণ্ঠস্বর আগামী প্রজন্মকে বিমোহিত করতে থাকবে। শিল্পীর পরিবার এবং ভক্তদের এই দুঃখের সময়ে আমার সমবেদনা। ওম শান্তি।’

গত মাসেই বর্তমান সরকারের দেয়া পদ্ম সম্মান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সন্ধ্যা। এত বছর পর গীতশ্রীকে ‘পদ্মশ্রী’ দেয়ার প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিল বাংলার শিল্প জগৎ।

গান কিংবা 'দিবস রজনী, আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি'-র মত রবীন্দ্রসংগীত তাঁর কণ্ঠে সমান জনপ্রিয় হয়েছে। প্রকৃতার্থেই তিনিই তো 'গীতশ্রী'! সম্প্রতি কেন্দ্র তাঁকে 'পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। 'গীতশ্রী' তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সন্ধ্যার বড় কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রত্যেকটি শৈলীর গান আপন ভাব অক্ষুণ্ন রেখে নিবেদন করা। ১২ বছর বয়সে কলকাতা আকাশবাণীর 'গল্পদাদুর আসর'-এ প্রথম গেয়েছিলেন গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের লেখা একটি গান। রেডিয়োয় প্রথম পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন পাঁচ টাকা। ১৩ বছর ১০ মাস বয়সে প্রথম বেসিক রেকর্ড। এইচএমভি থেকে প্রকাশিত। গানের কথা ও সুর গিরিন চক্রবর্তীর। এক দিকে 'তুমি ফিরায়ে দিয়ে যারে', উল্টো পিঠে 'তোমারো আকাশে ঝিলমিল করে চাঁদের আলো।'

বছর দু'য়েকের মধ্যে দু'টি বাংলা ছবিতে নেপথ্যে গাওয়ার সুযোগ। প্রথম ছবির সংগীত পরিচালক কিংবদন্তি রাইচাঁদ বড়াল। ছবির নাম 'অঞ্জনগড়'। দ্বিতীয় ছবি 'সমাপিকা'-র সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়। সে বছর, অর্থাৎ চল্লিশের দশকের শেষের দিকে তিনটি আধুনিক গানের রেকর্ড! চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার সাঙ্গীতিক উপস্থিতিই বলে দেয় যে তাঁর সফরটি দীর্ঘ হতে চলেছে।

সন্ধ্যার জন্ম ৪ অক্টোবর ১৯৩১ সালে। দক্ষিণ কলকাতার ঢাকুরিয়ায়। নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং হেমপ্রভা দেবীর কন্যা ছিলেন ছয় সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ। সন্ধ্যা নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তাঁদের বংশের আদি পুরুষ রামগতি মুখোপাধ্যায় বড় সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর পুত্র সারদাপ্রসাদও গান-বাজনার চর্চা করতেন। সারদাপ্রসাদের ছেলে সন্ধ্যার ঠাকুরদা। এঁরা প্রত্যেকেই উচ্চাঙ্গসংগীত নিয়ে চর্চা করতেন। সন্ধ্যার বাবা নরেন্দ্রনাথ ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। বাবার কাছেই প্রথম গান শেখা। সন্ধ্যাকে ভক্তিমূলক গান শেখাতেন তিনি। সন্ধ্যার মা-ও গান গাইতেন। নিধুবাবুর টপ্পা ছিল প্রিয়। মায়ের গানে মুগ্ধ হতেন সন্ধ্যা। ভাবতেন, না শিখে একজনের গলায় এত সূক্ষ্ম কাজ আসে কী করে!

১৯৪৩ সালের ৫ ডিসেম্বর। মাত্র ১২ বছর বয়সে অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স আয়োজিত সংগীত প্রতিযোগিতায় ভজন বিভাগে প্রথম হন সন্ধ্যা। সেই প্রতিযোগিতায় মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অংশ নেন।

সাড়ে ১৪ বছর বয়সে 'গীতশ্রী' পরীক্ষাতেও প্রথম। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি পরীক্ষাটি হয়েছিল। 'ভজন' ও 'গীতশ্রী' দু'টি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় গান গাওয়া শুরু হয় এবং তার পর থেকে তা চলতেই থাকে। একাধারে খেয়াল, ঠুংরি, ভজন, গজল, কীর্তন, ভাটিয়ালি, বাউল, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, পুরাতনী– বাংলা গানের এমন কোনও ধারা নেই, যেখানে তাঁর পদসঞ্চার লক্ষ করা যায়নি। এর পাশেই চলতে থাকে তালিম।

১৯৮৯ সালের ১৩ অক্টোবর প্রয়াত হন শাস্ত্রীয় সংগীত জগতের বিশিষ্ট শিল্পী ও শিক্ষক উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খানের পুত্র উস্তাদ মুনাওয়ার আলি খাঁ। ১৯৮৯-এর ২ ডিসেম্বর প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকায় সন্ধ্যার একটি স্মৃতিচারণ প্রকাশিত হয়েছিল। নিজের সংগীত শিক্ষা সম্পর্কে সন্ধ্যা সেখানে লিখেছিলেন, '১৯৫০-৫১ সাল হবে। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানদার (জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ) বাড়িতে বাবার কাছে মানে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর কাছে গাণ্ডা বাঁধি। আমার সংগীতে হাতেখড়ি অবশ্য শ্রদ্ধেয় যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। পরে বিভিন্ন সময় সঙ্গে শ্রদ্ধেয় চিন্ময় লাহিড়ি, এ কানন, ডিটি যোগী, গণপত রাও, জ্ঞানদা ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে– কিছু সুযোগ সুবিধেমত শিক্ষাগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছে। তা ওই পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই বাবার সঙ্গে যোগাযোগ। তখন বাবা সারা ভারতে গেয়ে বেড়াচ্ছেন। কোন স্থায়ী ঠিকানা থাকাও নেই। আজ এখানে, কাল ওখানে কনফারেন্স। বাবা কলকাতায় কখনও জ্ঞানদার ডিকসন লেনের বাড়িতে, কখনও ঝাউতলায় মি. কাদেরের বাড়িতে, জাস্টিস মি. মাসুদের বাড়িতে থাকতেন। পরে তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা হয় বালু হক্কক লেনে। সেখানে শিখতে যেতুম। সেখানেই ভাইয়ার সঙ্গে পরিচয়। আমি, মীরা (মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়) শিখতুম, মাঝে মাঝে ভাইয়া (মুনাওয়ার আলি)ও এসে আমাদের সঙ্গে তালিম নিতেন।'

বড়ে গোলাম আলির প্রয়াণের পর মুনাওয়ার আলির কাছেও গান শেখেন সন্ধ্যা। মুনাওয়ার সন্ধ্যাকে ডাকতেন সন্ধ্যাদি বলে। কেমন ছিল সেই শিক্ষা? একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। একবার তিনি বড়ে গোলামের কয়েকটি বিখ্যাত হিন্দি ঠুংরির অনুসরণে বাংলা ঠুংরি (যেমন– 'আসে না শ্রীতম', 'বাজুবন্ধ খুলে খুলে যায়', 'কাটে না বিরহেরি রাত' ইত্যাদি) রেকর্ড করেন মুনাওয়ারের তত্ত্বাবধানে। তখন তিনি সন্ধ্যাকে বলেছিলেন, 'দেখো সন্ধ্যাদি, যেমনভাবে বাবা অলংকরণগুলি করেছেন, সেভাবে আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। আর চেষ্টা করাটা বাঞ্ছনীয়ও নয়– বাবানে যো কিয়া ও জনম জনম করনে সে হামলোগোকো নেই আয়েগা।'

অতঃপর, তিনি একটু অন্যরকম করে অলংকরণগুলি করে দেখালেন এবং সন্ধ্যাকে সেভাবেই করতে বলেন। সন্ধ্যা লিখছেন, 'শিক্ষক হিসেবেও ভাইয়া ছিলেন আদর্শস্থানীয়। উচ্চাঙ্গ সংগীতে ওনার জ্ঞান ছিল অপরিসীম। বাবা জন্মেছিলেন গানেরই জন্য। আর ভাইয়া গান করা ছাড়াও যেভাবে গান শিখিয়েছেন তা অনবদ্য। তাঁর শিক্ষাদানের পদ্ধতিটি চমৎকার। কে কতটুকু গ্রহণ করতে পারে, কার কণ্ঠ কিরকম, কার সীমা কতটুকু সেসব বুঝেই শিক্ষা দিতেন ভাইয়া। শিক্ষাদানে কোন ফাঁকি ছিল না।'

সন্ধ্যার শিক্ষার দিকে তাকালে বলতে হয় তিনি মূলত পটিয়ালা ঘরানায় দীক্ষিত ছিলেন। শাস্ত্রীয় সংগীতের এমন তন্নিষ্ঠ তালিম থাকলেও আধুনিক, ছায়াছবি কিংবা রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার সময় তাঁর শাস্ত্রীয়সংগীত শিল্পীর সত্তাটি সযত্নে লুকিয়ে রাখতে পারতেন। যে গানের যে শৈলী, সেই গানে সেই শৈলীতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতেন।

চল্লিশের দশকের শেষ। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে 'বিদুষী ভার্যা' ছবির গান রেকর্ডিং সেরে সবে বাড়ি ফিরেছেন সন্ধ্যা। শচীন দেববর্মণের পরিচিত এক ব্যক্তি শচীন গঙ্গোপাধ্যায় সন্ধ্যার বাড়িতে এসে বললেন, 'শচীনকত্তা তোমাকে বম্বে নিয়ে যেতে চান। শচীনদার স্ত্রী মীরা দেববর্মণও তোমার গান শুনতে চেয়েছেন।' শচীনদেব আগে মুম্বই চলে গিয়েছেন। কলকাতায় সাউথ এন্ড পার্কের বাড়িতে মীরাদেবী তখনও থাকতেন। এর পর একদিন সন্ধ্যা গান শুনিয়ে এলেন মীরাদেবীকে। শুনে ভাল লেগেছিল তাঁর। অতঃপর, পর ১৯৫০-এ মুম্বই যাত্রা।

মুম্বইয়ে খার স্টেশনের পাশে 'এভারগ্রিন' হোটেলে শচীনদেবের আস্তানা ছিল। সন্ধ্যাদের ব্যবস্থাও সেখানেই করেছিলেন। শচীনদেবকে আগে থেকে চিনতেন সন্ধ্যা। কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে আলাপ হয়েছিল।

শচীনদেব নিয়ে গেলেও মুম্বইয়ে প্রথম প্লেব্যাকের সুযোগ হল অনিল বিশ্বাসের সুরে। 'তারানা' ছবিতে। শোনা যায়, সন্ধ্যার বড়দা মুম্বইয়ে অনিল বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অনিলের বাড়িতে সন্ধ্যারা মাঝে মাঝে যেতেন, গানবাজনা হত। অনিলের সুরে 'তারানা' ছবিতে গাইতে গিয়েই লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে পরিচয় হয়। গানটি ছিল লতার সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে– 'বোল পাপিহে বোল রে, তু বোল পাপিহে বোল'। অভিনেত্রী মধুবালার লিপে লতার কণ্ঠ। সন্ধ্যার গান ছিল শ্যামার লিপে। অনিলের সুরে পরে 'ফরেব' ছবিতেও গেয়েছেন সন্ধ্যা। পরিচয়ের কিছুদিনের মধ্যেই লতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়ে যায় সন্ধ্যার। লতা প্রায়ই আসতেন এভারগ্রিন হোটেলে সন্ধ্যার কাছে। সাধারণ বেশভূষা, আন্তরিক ব্যবহার। লতাকে ভাল লেগেছিল সন্ধ্যার। লতার সঙ্গে গান নিয়ে নানা আলোচনা হত। পরবর্তীকালে সন্ধ্যার ঢাকুরিয়ার বাড়িতেও এসেছেন লতা।

মোটের উপর ১৭টি হিন্দি চলচ্চিত্রে নেপথ্য গায়িকা হিসেবে গান করেছেন সন্ধ্যা। তবে যে-কোনও কারণেই হোক বলিউডে নিজের সাংগীতিক জীবন দীর্ঘায়িত করেননি। ব্যক্তিগত কারণে ১৯৫২ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৬৬ সালে কবি, গীতিকার শ্যামল গুপ্তের সঙ্গে বিবাহ। তাঁর বহু গানের গীতিকার শ্যামল। শ্যামলের সঙ্গে বিবাহের পর তাঁর জীবন খানিক বদলে যায়।

বাইরের জগতের অনেক কিছু যাতে সন্ধ্যাকে স্পর্শ না করে, যাতে তিনি নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকতে পারেন, সে চেষ্টা সর্বদা করে গিয়েছেন শ্যামল। এই সময়কাল সন্ধ্যার জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একের পর এক আধুনিক গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে। সলিল চৌধুরী, নচিকেতা ঘোষ, রবীন চট্টোপাধ্যায় কিংবা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মত সুরকারের সুরে একাধিক গান রেকর্ড করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে চুটিয়ে ফিল্মে নেপথ্যে গান।

সন্ধ্যার শিল্পী জীবনের অন্যতম মাইলফলক 'মহিষাসুরমর্দিনী'-তে অংশগ্রহণ। পঙ্কজকুমার মল্লিক, বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আর একঝাঁক

শিল্পীর সঙ্গে সন্ধ্যাও ছিলেন। সে সময় ‘লাইভ’ অনুষ্ঠান হত। রাত ৩টের মধ্যেই চলে যেতে হত ১ নং গার্স্টিন প্লেসে। গঙ্গাস্নান করে গরদের ধুতি-চাদর গায়ে ভাষ্য পাঠ করতেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। ‘বিমানে বিমানে আলোকের গানে জাগিল ধ্বনি’ গানটি এখনও সন্ধ্যার গলায় শোনা যায়। এই গানটি অবশ্য পরবর্তীকালে রেকর্ড করা। লাইভে তিনি কখনও গাননি এ গান। সুপ্রভা সরকারের রেকর্ড করা গান ‘অখিল বিমানে তব জয়গানে’ এবং প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের‘ ‘অমল কিরণে ত্রিভুবন মনোহারিণী’ লাইভে সন্ধ্যা গেয়েছেন বহুবার। আসলে ‘মহিষাসুরমর্দ্দিনী’-র অনুষ্ঠান যখন লাইভ হত, তখন বিভিন্ন শিল্পী প্রতি বছর একই গান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতেন। ‘অগ্নিপরীক্ষা’ ছবিতে সুচিত্রার লিপে প্রথম সন্ধ্যার কণ্ঠ শোনা যায়। প্রথম থেকেই সুচিত্রা-সন্ধ্যা জুটি সুপারহিট! সুচিত্রা এমনভাবে লিপ দিয়েছিলেন যে, দর্শকদের মনে হয়েছিল যেন তিনি নিজেই গাইছেন। সন্ধ্যার উচ্চারণ, অভিব্যক্তি, কণ্ঠের মড্যুলেশন– সব মিলিয়ে বাংলা ছবির গানের উপস্থাপন ভিন্ন মাত্রা পেতে থাকল এই সময় থেকে। পূর্বসূরীর মধ্যে অন্যতম কাননদেবীর গায়নশৈলীর থেকে ধীরে ধীরে যা পৃথক হতে থাকে। পুরুষদের ক্ষেত্রে যে কাজটি করেছিলেন হেমন্ত এবং পরবর্তী কালে মান্না, নারী কণ্ঠে তা করলেন সন্ধ্যা। হেমন্তের পূর্বসূরিদের অন্যতম কেএল সায়গল বা পঙ্কজকুমার মল্লিকের গানের স্টাইলের থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের প্রচলন করেছিলেন বাংলা গানে। ছবিতে উত্তমকুমারের লিপে গান মানেই যেমন দর্শকদের কাছে ছিল হেমন্তের কণ্ঠ, তেমন সুচিত্রা মানেই যেন সন্ধ্যা। বিভিন্ন ধারার গানে সন্ধ্যার অনায়াস বিচরণ যেমন তাঁর গান-জীবনের একটি দিক, তেমনই অন্য দিকে থাকে সুচিত্রার লিপে তাঁর কণ্ঠদান। এটি যেন তাঁর সংগীত জীবনের স্বতন্ত্র একটি অঙ্গ, যা জনপরিসরে তাঁকে দিয়েছিল ভিন্ন একটি আসন, হেমন্ত-মান্না বাদে সমসাময়িক বাংলার কোনও শিল্পীর যা ছিল না।

জাতীয় পুরস্কার-সহ বহু সম্মাননা পেয়েছেন সন্ধ্যা। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় পুরস্কার হয়তো মানুষের হৃদয়ে তাঁর স্থান। বহু দিনই জনপরিসরে গান করতেন না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে কয়েক বছর আগে এক অনুষ্ঠানে এসে হাতে মাইক তুলে নিয়ে দু’কলি গেয়েছিলেন। সুরেলা কণ্ঠের ঝলকে উপস্থিত শ্রোতারা লহমায় ফিরে যান অতীতে। সুরের ঐশ্বর্য সঙ্গে নিয়েই বিদায় নিলেন সন্ধ্যা।

ঋতপ্রভ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারতের সাংবাদিক

‘সন্ধ্যাপিসি আর লতাদিকে বাবা সবচেয়ে কঠিন গানগুলো দিতেন’

অন্তরা চৌধুরী

বাবা (সলিল চৌধুরী) খুব ভালবাসতেন পিসিকে। আমি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে পিসিই বলতাম। সন্ধ্যাপিসি আর লতাদিকে (মঙ্গেশকর) সবচেয়ে কঠিন গানগুলো বাবা দিতেন। কারণ, তিনি জানতেন যে, ওঁরাই গানগুলো ঠিকমতো গাইতে পারবেন। সন্ধ্যা পিসির সঙ্গে বাবার প্রথম গান ‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে’ আমার ছোটবেলার খুব প্রিয় গান ছিল। আমি যেদিন পিসিকে প্রথমবার গান শোনাই, সেই দিনটাও মনে আছে। তখন আমি টিনএজার। বাবা আমার একটা গান রেকর্ড করেছিলেন। গানটা ছিল ‘কোনও ভাল কবিতার দুটো পঙ্‌ক্তি দাও’। আমি যখন গানটা গাইলাম, পিসি মন দিয়ে শুনে খুব আশীর্বাদ করেছিলেন। আসলে উনি শাস্ত্রীয় সংগীত খুব ভালবাসতেন। আর তেমন ছিল পড়াশোনা। প্রত্যেক গানের রাগ উনি জানতেন। ‘শ্রাবণ অঝোর ঝরে’, ‘গহন রাতি ঘনায়’-এর মত কঠিন কঠিন গান কী সুন্দর গেয়েছেন। ‘উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা’ও কিন্তু কঠিন গান, উনি এমন করে গেয়েছেন মনে হত কত সহজ। আর বাবার সঙ্গে পিসির বোঝাপড়াও ছিল অন্যরকম। বাবা তো খুব ছটফটে মানুষ ছিলেন। হয়তো কোনও গানের মুখরা বানালেন বা কোনওটার অন্তরা, ব্যস! উঠে পড়লেন। বলতেন, ‘বাকিটা পরে শেষ করছি।’ সন্ধ্যাপিসি শুনতেন না। বাবাকে রিহার্সাল বা রেকর্ডিং রুমে দরজা বন্ধ করে আটকে রাখতেন। বলতেন, ‘না, সলিলদা, আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি, যতক্ষণ না শেষ হবে, আমি বেরোতে দেব না’। এ সব গল্প মায়ের কাছে শুনেছি।

আর খুব ভাল মানুষ ছিলেন। অন্যকেও জায়গা ছাড়তে জানতেন। একবার এক অনুষ্ঠানে গিয়েছেন সন্ধ্যাপিসি আর মা (সবিতা চৌধুরী)। অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা মাকে বললেন, আগে সন্ধ্যাদি গাইবেন, তার পরে মা গাইবে। মা বললেন, ‘সন্ধ্যাদির গানের পরে আমার গান আর কে শুনবে?’ কিন্তু অনুষ্ঠানের আয়োজকরা শুনবেন না। সন্ধ্যাপিসি এসে যখন ঘটনাটা জানতে পারলেন, তখন পরিষ্কার মাকে বলেছিলেন, ‘আগে তুই গাইবি, তার পরে আমি গাইব।’ আর সেটাই করেছিলেন।

সকলের খোঁজও রাখতেন। মাঝে আমার স্বামী খুব অসুস্থ ছিলেন। এক মাস হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সে সময়ে উনি নিজে ফোন করে খোঁজ নিয়েছেন। আশ্বাস দিয়েছেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবার বইটা যখন বেরোল, একটা আর্টিকল লিখে দিয়েছিলেন। আমি আর মা গিয়েছিলাম। নিজে রেঁধে খাইয়েছিলেন আমাদের। কত গল্প করতেন। খুব হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। কোনও দম্ভ ছিল না। আর বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন।

শেষবার যখন ফোনে কথা হল, তখনও বাবার কথা বলছিলেন, ‘তুমি কি জানো, তোমার বাবার অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর গানগুলো ওরা বার করছে। তুমিও কালেক্ট করে রেখো। না হলে তো কেউ আর জানতে পারবে না।’ তবে শেষে ওঁকে পদ্মশ্রী দেওয়ায় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। এই অপমানটা না করলেই হত। ওঁর মত মানুষের এই বয়সে এটার দরকার ছিল না। **অন্তরা চৌধুরী** ভারতের সংগীতশিল্পী

শ্রদ্ধাঞ্জলি//৮

‘মধু মালতী ডাকে আয়’

জগন্নাথ বসু

প্রেমের দিনগুলোয় ঊর্মিমালার বাড়ি যাওয়ার পথে এই গান শুনতে শুনতে জাগত শিহরন। ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’ দৃশ্যে উত্তম না সুচিত্রা কার দিকে তাকাব, এ-বৃদ্ধ বয়সে গান শুনে হয় যৌবন!

অথচ যৌবনে তোমরা ছিলে কাছাকাছি,
সেদিনের সেই গান আজও লক্ষ্য করে
মহামানবের তীর, সাগরসঙ্গম।
এ-বৃদ্ধ বয়সে গান শুনে হয় আক্রান্ত যৌবন!

আবৃত্তিকার হিসেবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই লাইনগুলো লিখেই শুরু করছি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে এ নিবন্ধ। চার প্রজন্মকে শুনিয়ে গেলেন তাঁর যুগসৃষ্টিকারী কণ্ঠ। রেখে গেলেন অজস্র রেকর্ড, বাঙালি জীবনে সুচিত্রা-উত্তম আর হেমন্ত-সন্ধ্যার সার্থক রসায়নের কাহিনি ধরা আছে সেলুলয়েড মাধ্যমে।

একদিন কলামন্দিরে আমি আর ঊর্মিমালা শ্রুতিনাটক পরিবেশনের পরেই ছিল সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান। প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। আমরা তাঁর অনুমতি নিয়ে উইংসের ধারে বসে গান শুনলাম। অবাক হয়ে লক্ষ করছিলাম, ভাব থেকে ভাবান্তরে ওঁর অনায়াস যাতায়াত। ‘জয়জয়ন্তী’ ছবির ‘আমাদের ছুটি ছুটি’ যখন গাইছেন, তখন মুখমণ্ডলে শিশুর সারল্য আর উল্লাস। তার ঠিক পরেই ‘কোন পথে গেল শ্যাম’ গানে উপচে পড়ল প্রেম। তাঁর নিবেদনে যা দেখেছি, তা অভিনয়েরই দ্যুতি! মনে হচ্ছিল, আমরাও শ্রুতিনাটকের সংলাপ বলার সময়ে তো চোখমুখে তার

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের শোক

ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২: রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বাংলা গানের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। এক শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপমহাদেশের সংগীত জগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান এদেশের জনগণ চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তিনি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শোক

ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রবাদপ্রতিম সংগীতশিল্পী গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, উপমহাদেশে গানের মুগ্ধতা ছড়ানোর পাশাপাশি মহান মুক্তিযুদ্ধে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

সূত্র: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

ছাপ পড়ে। সেটাই স্বাভাবিক! আবার চোখ বুজে সন্ধ্যাদির গান শুনলেও তাঁর কণ্ঠে লিরিকের সেই অনুভব বুঝতে পারা যায়। এটাই কণ্ঠ দিয়ে ছবি আঁকা। গানের মর্মকথা এতটা গভীরে আত্তীকরণ করেছিলেন বলেই সে গান এমন রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

আজও যখন 'পথে হল দেরি'র 'এ শুধু গানের দিন' বা 'সবার উপরে' ছবির 'ঘুম ঘুম চাঁদ' শুনি, তখন গানের মধ্যে নিহিত সুচিত্রা সেনের এক্সপ্রেশন সন্ধ্যাদির গলা শুনেই স্পষ্ট দেখতে পাই।

১৯৬১। আমি তখন বোধহয় ক্লাস এইট কি নাইন! স্কুল থেকে ফেরার সময়ে বা অন্য কোনও ছুতোয় সবে টুকটাক সিনেমা হলে ঢুঁ মারা জীবনে শুরু হয়েছে। 'এই পথ যদি না শেষ হয়'-এর আবেশে তখন তো সব বাঙালিই বিভোর। নিশ্চিত বলতে পারব না, হাতিবাগানের উত্তরা না রূপবাণী কোথায় ছবিটা দেখেছিলুম।

উত্তম না সুচিত্রা কার দিকে তাকিয়ে থাকব, উঠতি বয়সের সেটাও সমস্যা। সুচিত্রা সেনের উচ্ছল অভিব্যক্তির প্রতিটি ভঙ্গি ও সন্ধ্যার কণ্ঠ যেন মিলেমিশে একাকার! সুচিত্রা পর্দায় রিনা ব্রাউন হয়ে উঠতে চোখেমুখে লাগাম-ছাড়া খুশি মিশিয়েছিলেন। সেই বয়সে বুঝিনি, আজ মনে হয় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের আর্টিস্টিক ইকনমির বোধ কতটা প্রখর! তা হলেই কণ্ঠ দিয়ে ওই সব এক্সপ্রেশনের রাশ বেঁধে রাখা যায়। ৬০ বছর বয়স হল গানটির। আমরাও প্রবীণ হলাম। গানটি বুড়ো হল না! আমাদের মায়েরা সন্ধ্যার গান গাইতেন! আমার মায়ের বোধহয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ ঘিরে আজকের ভাষায় একটু ক্রাশই ছিল। বাপি তাই হেমন্তের গান চললেই রেডিয়ো বন্ধ করতে ব্যস্ত হতেন। সেই চোরা খুনসুটি আমরা ভাইবোনেরা উপভোগ করতাম।

আসলে সবটাই একটা আস্ত সময়, যা জুড়ে আছেন কয়েকজন মানুষ! তখনও কংক্রিটের টালা ব্রিজ তৈরি হয়নি। 'অপুর সংসার' ছবিতে যে পলকা ব্রিজের উপরে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হেঁটে যাচ্ছেন, তা ভেঙে নতুন ব্রিজ হচ্ছিল। তখন আমাদের টালাপার্কের বাড়ি থেকে বেলগাছিয়া ব্রিজ পেরিয়েই কোথাও যেতে হত। মনে আছে, দত্তবাগানের মুখে প্রায়ই চোখে পড়ত, বড় বড় হরফে লেখা 'সুচিত্রা সেলুন'! তলায় সংযোজন, 'এখানে উত্তম রূপে চুল কাটা হয়'! তবে আমাদের সেই সময়ে সিনেমা দেখা মোটেই হাতের মোয়া ছিল না। আমি উত্তম-সুচিত্রা জুটির বহু স্মরণীয় ছবিই কিছুটা পরে দেখেছি। তখন টিভি ছিল না। কিন্তু মাঝেমধ্যেই উত্তমকুমারের সিনেমা দেখানো হত হয়তো পর পর সাত দিন, সাতটা আলাদা ছবি! 'অগ্নিপরীক্ষা', 'সবার উপরে', বা 'পথে হল দেরি' ইত্যাদি। আমি টালায় থাকলেও কিন্তু উত্তম, সুচিত্রার বেশির ভাগ ছবি দেখেছি বাগমারি খালের ধারে 'সুরশ্রী' কিংবা একেবারে বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে 'আলেয়া'য়! সেই হলগুলোরও বোধহয় আজ কোনও চিহ্ন নেই।

তবে হেমন্ত, সন্ধ্যা, উত্তম, সুচিত্রার কথা বলে লেখা শুরু হলেও আরও অনেকে এই লেখায় আছেন। যেমন, 'মায়ামৃগ' দেখেছিলাম রাধা-য়। সেখানেও সন্ধ্যা রায়ের লিপে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় অনবদ্য! 'ও বক বক বকম বকম পায়রা'য়!

এক সরস্বতী পুজোর দিনে উর্মির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি ওদের আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতে। তখন আমাদের প্রেমটা হব-হব করছে। ওদের উঠোন মালতী লতার গন্ধে ম-ম করছিল। ওই গাছটা দেখলে আমার সন্ধ্যার 'মধুমালতী ডাকে আয়' মনে পড়ত। মনে হয়, আমাদের থেকে যারা অনেক ছোট, তাদের জন্যও ওই গান গত জনমের ইশারা বয়ে আনে।

'আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি' যে কবে থেকে আমার নিজের গান হয়ে উঠেছে, তা মনে পড়ে না! আমাদের সময়ের অনেকেরই নির্ঘাত তেমন অবস্থা! সুর সঞ্চারে নিতান্তই বদকণ্ঠ লোকবাসী হয়েও গানটা গুনগুনিয়ে গাইবার চেষ্টা পর্যন্ত করে বসেছি। এর অনেক পরে একবার মালদহের একটি কলেজের অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করতে গিয়ে মানবদার (মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছিলাম। তখনও তাঁর কণ্ঠে গানটি যেন আবার ফিরে পেলাম। গাড়িতে কলকাতায় ফেরার পথে এই গানের আচ্ছন্নতার কথা মানবদাকে বলতেই উনি একটি রোমাঞ্চকর স্মৃতি আমার সঙ্গে ভাগ করে নিলেন। তখনকার দিনে আকাশবাণীতে লাইভ অনুষ্ঠান তিনটি অধিবেশনে সম্প্রচার করা হত। শিল্পীরা অনেকেই বাড়ি না-ফিরে ক্যান্টিনে খেয়ে নিতেন। সকালের অনুষ্ঠানের পরে বিকেল বা সন্ধের অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করতেন। এমনই এক বিকেলে মানবদা সন্ধ্যাদির স্বামী, প্রখ্যাত গীতিকার শ্যামল গুপ্তের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলেন। আর একটু পরেই ফের মানবদার লাইভ শুরু হবে। তখনও শ্যামল-সন্ধ্যার বিয়ে হয়নি। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম জপের মতো শ্যামলবাবুর মুখে তখন শুধুই সন্ধ্যা আর সন্ধ্যার কথা। সন্ধ্যার গলার কাজ, নিয়মশৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, সুচারু সাজগোজ ইত্যাদি আর ইত্যাদি! কথা যেন থামছেই না! হঠাৎই সিগারেটের প্যাকেট থেকে রাংতা সাঁটা সাদা কাগজটা বের করে কী-সব লিখলেন। তারপর কলম বন্ধ করে মানবেন্দ্রকে শ্যামল গুপ্ত বলছেন, শোন তো লাইনগুলো কেমন হল! মানবদার বলা কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজছে! শীতের বিধুর সন্ধ্যা নামছিল কলকাতায়! আর শ্যামল গুপ্ত তাঁর সদ্য লেখা লিরিক শোনাচ্ছেন। সেই জন্ম মুহূর্ত, মানবদার কালজয়ী গানটির। পরে তাতে তিনি সুর বসান। আসলে কিন্তু এই গান জুড়ে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ই রয়েছেন। এখনও কারও কারও মোবাইলের রিংটোনেও এ গান শুনতে পাই। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং শ্যামল গুপ্তের প্রেমের চিরন্তন সৌধ।

মনে আছে কোনও একটি অনুষ্ঠানে যখন আমি সন্ধ্যাদির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়েছি, তিনি আমাকে বললেন 'আপনাদের নাটক আমি শুনি! আমার ভাল লাগে। আপনাদেরও তো কণ্ঠ নিয়ে খুব চর্চা করতে হয়। কোনও শিল্পই কঠিন চর্চা ছাড়া আয়ত্ত করা যায় না। চর্চায় কিন্তু আনন্দও আছে।' আমি তাঁর সঙ্গে একটু বেশিক্ষণ কথা বলার ফন্দিফিকির করছিলাম! তাই একটু পাকামি করে আমাদের দেওয়া শম্ভু মিত্রের উপদেশের কথা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে বললাম– 'হারমোনিয়মে থাকে ক্রোম্যাটিক স্কেল। সা-সা-রে-গা অর্থাৎ পর পর পর্দার উপরে গলা চালিয়ে ব্যায়াম করার মিড়। অভিনেতা, আবৃত্তিকারদেরও এভাবে কণ্ঠচর্চা করতে হয়।' মন দিয়ে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাদি আমার কথাগুলো শুনলেন। যুগসৃষ্টিকারী মানুষ কেমন নম্র, ভদ্র হয় তা কাছ থেকে দেখলাম। ওঁর মৃত্যুর খবর শোনার পর এমন সব দৃশ্যই ভেতরে তোলপাড় করছিল।

শুনেছি তিনি সুরকারদের বলতেন, কবে আপনি গান শেখাতে আসবেন! কখনও বলতেন না, কবে আপনি গান তোলাতে আসবেন! এই সশ্রদ্ধ মনোভাব আজকের দিনে শিক্ষণীয়। বহু দশক আগে থেকেই মাসে দুটোর বেশি অনুষ্ঠান করতেন না, কিন্তু চর্চা তো রোজকার উপাসনা। সন্ধ্যাদির অন্তরঙ্গ বলয়ের মানুষ স্বপন মুখোপাধ্যায়ের কাছে শুনছিলাম, শেষবার অসুস্থ হয়ে পড়ার কিছুদিন আগেও তিনি রেওয়াজ করেছেন।

আজও আমাদের শহরে উৎসব আসে পুজোর গানে, লাউডস্পিকারে! পুজো প্যান্ডেলের গান এক একটা পাড়ার রুচির মানও নির্ধারণ করে দেয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, এবার পুজোতেও আকাশবাতাস ভরে থাকবে সন্ধ্যা বা লতারই গান। বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতায় আছে, 'তিনি এলেন, কিছুদিন থাকলেন, তারপর ফিরে গেলেন, তিনি তো বেড়াতে এসেছিলেন'! সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়েরা চিরকালীন। তাঁর ক্ষেত্রে এ কথা বলা যাবে না!

জগন্নাথ বসু ভারতের বাচিকশিল্পী

শ্রদ্ধাঞ্জলি//৯

সুরের জাদুতে তিনি নিজেই ইন্ডাস্ট্রি

সুজিষ্ণু মাহাতো

কলকাতার পানশালা থেকে মফস্‌সলের মাচা। সর্বত্র আজও ‘ডিস্কো ডান্সার’ থেকে ‘এ আমার গুরুদক্ষিণা’র রমরমা। বাপ্পি লাহিড়ির জনপ্রিয়তায় ভর করেই এই মধ্য কলকাতার রেস্তোরাঁটি মাছের নানাবিধ পদের জন্য পরিচিত। সেই টানেই সেখানে গিয়েছিলাম। সেটির উপরের তলায় গানও হয়। খাবারের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করার সময় হঠাৎ দেখি, উপর থেকে নামতে নামতে রেস্তোরাঁর এক কর্মীর সঙ্গে রেস্তোরাঁয় আসা একজনের তুমুল বচসা। প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। বাকিরা তাঁদের শান্ত করতে এই বিবাদের কারণ জানা গেল। ওই ভদ্রলোক খাওয়া শেষ করে বেরনোর আগে একটি গানের অনুরোধ করেছিলেন। সেই গান শেষ হওয়ার আগেই রেস্তোরাঁর ওই কর্মী তাঁকে বিল ধরিয়ে দিয়েছেন। গানে ডুবে থাকা ভদ্রলোক এমন ব্যাঘাতে রেগে কাঁই!

যাঁর গাওয়া গানের জন্য এত কাণ্ড, তিনি প্রয়াত হলেন মঙ্গলবার রাতে। বাপ্পি লাহিড়ি। গানটাও সবার চেনা, ‘ডিস্কো ডান্সার’ ছবিতে বাপ্পিরই সুরে, ‘ইয়াদ আ রহা হ্যায়, তেরা প্যার।’ বাপ্পির সুর দেওয়া, গাওয়া তুমুল জনপ্রিয় গানগুলি সংগীতের বিচারে কতটা উঁচু দরের, সে তর্ক ভিন্ন। তবে টানা তিন-চার দশক ধরে সেই সুরগুলির উপরে ভিত্তি করে যে একাধিক পেশা আবর্তিত হয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বড় শহরে এমন পেশাগুলির মধ্যে যেমন নানা হোটেল-রেস্তোরাঁ-পানশালার গায়ক-গায়িকা রয়েছেন, শহরের বাইরে, গ্রামবাংলায় রয়েছেন বহু ‘কণ্ঠী’ শিল্পী। তাঁদের অনেকের তিন-চার দশকের গানের কেরিয়ারের মূল নির্ভরতা বাপ্পি লাহিড়ির অসংখ্য হিট গান। তার মধ্যে যেমন রয়েছে, ১৯৭৫-এ মুক্তি পাওয়া ‘চলতে চলতে মেরে ইয়ে গীত ইয়াদ রাখনা’, তেমন রয়েছে ১৯৮২ সালের ‘জিমি জিমি আ জা আ জা’, ‘আই অ্যাম আ ডিস্কো ডান্সার’ বা ‘কোই হঁহা আয়ে নাচে নাচে’। কেবল গায়করাই নন, চলতি কথায় ‘মাচা’ বলে পরিচিত এ সব জলসার উপরে বছরের পর বছর নির্ভর করেছেন অসংখ্য যন্ত্রশিল্পী। জনপ্রিয় সুরকে নির্ভর করে যে ছোট আকারে হলেও এক অসংগঠিত অর্থনীতি চলেছে, এখনও চলছে, সে কথা অনস্বীকার্য। বাংলায় খ্যাতনামা সুরকার অতীতে অনেক ছিলেন, আজও আছেন, ভবিষ্যতেও হবেন। কিন্তু নাক-উঁচু সংস্কৃতির বাইরে অপরেশ ও বাঁশরী লাহিড়ির পুত্র একাই এক শিল্পবৃত্তের জন্মদাতা।

এই বৃত্তেরই মধ্যে তিন দশকের বেশি সময় ধরে গান গেয়ে কাটিয়েছেন মালদহের বাসিন্দা মৃণাল চক্রবর্তী। ষাটোর্ধ্ব মৃণালবাবু বলছিলেন, তাঁরা আগামী বেশ কয়েক মাস কেবল বাপ্পি লাহিড়ির গানই গাইবেন। যন্ত্রশিল্পীদের সঙ্গে বসে গান বেছে রেওয়াজও করে নিয়েছেন তিনি। বাপ্পি লাহিড়ির প্রয়াণের পরে শ্রোতারা আরও বেশি করে তাঁর

গান শুনতে চাইবেন আন্দাজ করেই এমন প্রস্তুতি। তবে গানের চাহিদা তিন দশক ধরেই একই আছে বলে জানাচ্ছেন মৃণাল। তাঁর অভিজ্ঞতা, 'যত দিন ধরে গান গাইছি দেখছি, 'শরাবি', 'ডিস্কো ডান্সার', 'গুরুদক্ষিণা', 'অমর সঙ্গী'র গানগুলো গাইতেই হবে।'

এখানেই অনন্য বাপ্পি লাহিড়ি! জনপ্রিয়তার কত পরতে যে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছেন তিনি! কয়েক বছর আগেও 'ডার্টি পিকচার' ছবিতে 'উ লা লা উ লা লা... তু হ্যায় মেরি ফ্যান্টাসি' গানটার কথা মনে পড়তে পারে। একদা সেক্স বম্ব দক্ষিণী নায়িকা সিল্ক স্মিতার জীবনের আদলে তৈরি বিদ্যা বালন ও নাসিরুদ্দিন শাহের সেই ছবির জনপ্রিয়তার অন্যতম স্তম্ভ তো ওই গানই। আবার উত্তমকুমারের শেষ ছবি 'ওগো বধূ সুন্দরী'র অন্যতম আকর্ষণ বাপ্পির সুর। বোতলে ঠুনঠুন আওয়াজ তুলে 'এই তো জীবন'কে ভুলতে পারে!

দক্ষিণী নায়িকার কথায় মনে পড়ে গেল, হিন্দি ছবিতে জয়াপ্রদা ও শ্রীদেবীর উত্থানের পিছনেও কিন্তু আছে এই বঙ্গসন্তানের অবদান। 'মাওয়ালি' বা 'তোফা' কিংবা 'হিম্মতওয়ালা' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় ছিলেন জিতেন্দ্র, তাঁর বিপরীতে ছিলেন শ্রীদেবী, জয়াপ্রদা। সেই সব ছবির 'তোফা তোফা লায়া লায়া' কিংবা 'লড়কি নেহি হ্যায় তু লকড়ি কা খাম্বা হ্যায়' গানগুলি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত দিগ্বিজয়ের ঘোড়া ছুটিয়েছিল।

বাপ্পি বা তাঁর গান অবশ্যই এই মাচা-অর্থনীতির জন্ম দেয়নি। বাপ্পি না থাকলেও মাচার অনুষ্ঠানে অন্য শিল্পীর গান নিশ্চয়ই বাজত। তবে বাংলায়, বিশেষত গ্রামবাংলায় বাপ্পি লাহিড়ির জনপ্রিয়তার শুরুর সঙ্গে বাংলায় রাজনৈতিক-সামাজিক পরিমণ্ডলের বদলের এক অদ্ভুত সমাপতন চোখে পড়ে। মুম্বইয়ে বাপ্পির জনপ্রিয়তার শুরু সত্তরের দশকের শেষ থেকে। ১৯৭৫-এ মুক্তি পাওয়া 'জখমি'র 'জ্বলতা হ্যায় জিয়া মেরা', ১৯৭৬-এর 'চলতে চলতে' ছবির 'চলতে চলতে মেরে ইয়ে গীত ইয়াদ রাখনা', ১৯৭৭-এর 'আপ কি খাতির' এর 'বোম্বাই সে আয়া মেরা দোস্ত' বা ১৯৭৯-র 'লহু কে দো রঙ্গ'-এর 'চাহিয়ে থোড়া প্যার'– বাপ্পির সুরে একের পর এক গান ঝড় তুলেছিল। বিপ্লবের দশক শেষে ক্লান্ত, ধ্বস্ত বাংলার জনপরিসরে কি এভাবেই শুরু হয়েছিল নতুন এক সেলিব্রেশন?

বাংলায় সেই সময়েই বামফ্রন্ট শাসনের শুরু। রাজনীতির প্রচারের মুখ শহর থেকে গিয়েছে গ্রামে। নকশাল আন্দোলনের পরে সামাজিক পরিস্থিতিতে স্থিতাবস্থাও এসেছে। শহরের বাইরের বিপুল সংখ্যক মানুষ ভূমিসংস্কার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আত্মবিশ্বাস পেয়েছিলেন। সেই স্থিতাবস্থা, গ্রামাঞ্চলের তুলনামূলক সমৃদ্ধির সময়েই এল আশির দশকের গোড়ায় বাপ্পি লাহিড়ির গান-সুর ও মিঠুন চক্রবর্তীর নাচের যুগলবন্দিতে 'ডিস্কো ডান্সার'। প্রাতিষ্ঠানিক বাম-রাজনীতির পরিশীলিত পরিভাষায় অব্যর্থভাবে 'অপসংস্কৃতি'। তবু যে জনপ্রিয় ভোট বামফ্রন্টের ভিত্তি ছিল, সেই জনপ্রিয়তা, সেই সেলিব্রেশন যে বাপ্পি লাহিড়ির পালে হাওয়া দিয়েছিল তা অনস্বীকার্য। বাংলা থেকে মুম্বই গিয়ে লড়াই করে পাওয়া মিঠুনের ব্যক্তিগত সাফল্যের কাহিনিও হয়তো জনমানসে সেই জনপ্রিয়তাকে আরও জোরদার করে তুলেছিল। জনপরিসরে গানের একদিকে তখন বাপ্পির সুরে 'ডিস্কো ডান্সার', অন্য দিকে ঊষা উত্থুপকে প্রায় প্রতি জলসায় গাইতে হয় বাপ্পিরই সুরে 'রাম্মা হো হো'। বামফ্রন্ট সরকারও যে এই জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করতে পারেনি, 'হোপ ৮৬'-র মত অনুষ্ঠান আয়োজন তারই ইঙ্গিত।

দীর্ঘদিন ধরে গ্রামবাংলার জলসা তথা মাচার অনুষ্ঠানে গান করেন এমন অনেকেরই বলছেন, 'ডিস্কো ডান্সার'-এর পর থেকে ওই গানগুলির জনপ্রিয়তা যে শুরু হয়েছে তা এখনও অটুট। সেই সময়টা গ্রাম-মফস্সলে সিনেমা দেখার ভিসিআর যেমন ঢুকছে, তেমনই ক্লাবের মত গণসংগঠন বাড়তে থাকায় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এমন অনুষ্ঠান আয়োজনের হিড়িকও। আর কী অদ্ভুত, ১৯৮৭-র 'ডান্স ডান্স' ছবিতে সেই পশ্চিমবঙ্গেরই অনুষঙ্গ। যে জলপাইগুড়িতে বাপ্পির জন্ম, সেই জলপাইগুড়ির অনুষ্ঠানই ছবির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

উত্তর থেকে দক্ষিণ– বাংলার সর্বত্রই কয়েক দশক ধরে জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে বাপ্পির গানগুলি। কথা হচ্ছিল দুর্গাপুরের বাসিন্দা, গায়িকা ঋতুপর্ণা বক্সীর সঙ্গে। দু'দশকের বেশি সময় ধরে এমন অনুষ্ঠানে গান করে যাচ্ছেন তিনি। ঋতুপর্ণার অকপট স্বীকারোক্তি, 'আমরা যারা মাচায় গান করি তাঁদের অস্তিত্ব পুরোপুরি নির্ভর করে বিখ্যাত শিল্পীদের উপরেই। দর্শক আমাদের গলায় তাঁদের গানই শুনতে চান।'

'রাত বাকি বাত বাকি', 'রাম্মা হো', 'কোই ইঁহা আয়ে নাচে নাচে' থেকে শুরু করে 'মঙ্গলদীপ জ্বেলে' সব রকম গানই গেয়ে থাকেন ঋতুপর্ণা। বাঙালি ভুলে যায়, মঙ্গলদীপের মতো প্রার্থনাসংগীত বা একদা আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে জনপ্রিয় 'তখন তোমার একুশ বছর বোধহয়' গানের সুরস্রষ্টা একজনই। বাপ্পি!

দুর্গাপুজো থেকে সরস্বতী পুজো হয়ে দোল পর্যন্ত মাচা ফাংশনের সিজনে, তাতে প্রতিদিন দেড় হাজার টাকা বা তারও বেশি আয় করেন গায়ক-গায়িকারা। কত দূরে অনুষ্ঠান, তা বিচার করে পারিশ্রমিকও বাড়ে। পাড়ার জলসা নয়, বহু বিয়েবাড়িতেও এমন অনুষ্ঠান হয়। অনেকে কোনও হোটেলে নিয়মিত গান করেন। তবে মঞ্চ যেখানেই হোক, এই জনপ্রিয় গানগুলি যে তার একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে, তা জানাচ্ছেন সব শিল্পীই। ঋতুপর্ণা জানাচ্ছেন, 'এই গানগুলোকে ভর করেই তো আমরা সংসার করেছি, ঘরবাড়ি করেছি, পরিবারকে দেখাশোনা করেছি।'

সদ্যপ্রয়াত বাপ্পির কৃতিত্বকে তাই তাঁর গা-ভরা গয়নায় বিচার করলে হবে না। উত্তমকুমারের যুগে 'লোলা লুলু কেন তোমার বয়স হয় না ষোলো'তেই শেষ হয়নি বাপ্পির সংগীত-মূর্ছনা। আশির দশকে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'অমরসঙ্গী' ছবির সেই গান 'চিরদিনই তুমি যে আমার'কে ভুলতে পারে! তাপস পাল-শতাব্দী রায়ের 'গুরুদক্ষিণা' ছবিতে তাঁর সুরেই কখনও বেজেছে 'এ আমার গুরুদক্ষিণা', কখনও বা আশা ভোঁসলের কণ্ঠে 'ফুল কেন লাল হয়'। নদীর ধারে তাপসের সামনে নাচছেন শতাব্দী, গাড়িতে বসে রঞ্জিত মল্লিক।

এই যে উত্তম থেকে তাপস, প্রসেনজিৎ অবধি দীর্ঘ ধারাবাহিকতা, এখানেই তিনি একক ইন্ডাস্ট্রি। এই ইন্ডাস্ট্রিকে কখনও বাংলা-হিন্দির গণ্ডিতে বাঁধা যায় না। 'শরাবি' ছবিতে তাঁর সুরে 'দে দে পেয়ার দে' গানে কখনও থাকতে পারে 'আল্লা মেঘ দে পানি দে'-র অনুষঙ্গ। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? শুধু 'ওগো বধূ সুন্দরী নয়, উত্তম থেকে প্রসেনজিৎ, তাপস অবধি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে আছে তাঁর গান। আর সেই জনপ্রিয় সুরের ডানাতেই এই ইন্ডাস্ট্রির উড়ান। সুজিষ্ণু মাহাতো সাংবাদিক

মুম্বইয়ে প্রয়াত বাপ্পি লাহিড়ি

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ মঙ্গলবার মধ্যরাতে মুম্বইয়ের জুহুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন বাপ্পি লাহিড়ি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। গত বছরের এপ্রিল মাসে তাঁর করোনা ধরা পড়ে। সে-সময় মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি।

মঙ্গলবার মধ্যরাতে 'অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপ নিয়া (ওএসএ)'-তে আক্রান্ত হয়ে স্থানীয় ক্রিটিকেয়ার হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। গত একমাস তিনি বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার জন্য হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।

১৯৭০ থেকে ৮০-এর দশকে হিন্দি ছায়াছবির জগতে অন্যতম জনপ্রিয় নাম বাপ্পি লাহিড়ি। বলিউডে 'ডিস্কো ডান্সার', 'চলতে চলতে', 'শরাবি', বাংলায় 'অমর সঙ্গী', 'আশা ও ভালবাসা', 'আমার তুমি', 'অমর প্রেম' প্রভৃতি ছবিতে সুর দিয়েছেন। গেয়েছেন বহু গান। ২০২০ সালে তাঁর শেষ গান 'বাগি-৩' এর জন্য। কিশোরকুমার ছিলেন বাপ্পির তুতো মামা। বাবা অপরেশ লাহিড়ি ও মা বাঁশরী লাহিড়ি। দু'জনেই সংগীত জগতের মানুষ ছিলেন। একমাত্র সন্তান বাপ্পিও ছেলেবেলা থেকেই গানের প্রতি আকৃষ্ট হন। মা-বাবার কাছেই পান প্রথম গানের তালিম। মা-বাবা নাম দিয়েছিলেন অলোকেশ, কিন্তু জনপ্রিয়তা পান বাপ্পি নামে।

বাপ্পি জন্ম ১৯৫২ সালের ২৭ নভেম্বর জলপাইগুড়িতে। দীর্ঘদিন বাংলা ও হিন্দি ছবির গান গেয়েছেন। সুর দিয়েছেন। ছিল গায়কির নিজস্ব কায়দা, যা তাঁকে হিন্দি ছবির জগতে অনন্য পরিচিতি দিয়েছিল। পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার এবং সম্মান। বাপ্পি লাহিড়ি রাজনীতিতেও নেমেছিলেন। বিজেপিতে যোগ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুর কেন্দ্র থেকে লোকসভা ভোটে লড়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতিতে কখনওই স্বচ্ছন্দ বোধ করেননি বাপ্পি। সংকলিত

প্রবন্ধ

ভাষা আন্দোলনে নারীদের অবদান

এ ক উ পে ক্ষি ত অ ধ্যা য়

ঈমাম হোসাইন

বাংলার এ ভূখণ্ডের প্রত্যেকটি আন্দোলন সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয়। তেভাগা থেকে ব্রিটিশবিরোধী, ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীন দেশে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন থেকে অদ্যাবধি যতগুলো গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে, তার অধিকাংশতেই শুধু অংশগ্রহণ নয়, সামনের কাতারে ছিল বাংলার নারীরা। ভাষার জন্য এ ভূখণ্ডের মানুষদের দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলন করতে হয়েছে। যার গোড়াপত্তন হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। ভারত ভাগের পরে মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে সংঘটিত আন্দোলন ছিল বাংলা ভাষাভাষীদের নতুন জাতি রাষ্ট্র গঠনের বাঁক পরিবর্তনের আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনে নারী সমাজের অবদানের কথা স্মরণ করতে হলে একটু পেছনে যাওয়া প্রয়োজন।

১৯৪৭ সালের ১৭ নভেম্বর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়ার অনুরোধ সম্বলিত একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর সেই স্মারকলিপিতে বরেণ্য ব্যক্তিদের সাথে স্বাক্ষর করেছিলেন 'জয়শ্রী' পত্রিকার সম্পাদিকা লীলা রায় এবং মিসেস আনোয়ার চৌধুরী। সিলেট জেলার নারীদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছিল তৎকালীন মন্ত্রী আবদুর রব নিশতারের কাছে সিলেটের রাজকীয় বালিকা বিদ্যালয়ে ১৯৪৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে। এতে স্বাক্ষর করেছিলেন মহিলা মুসলিম লীগের জেলা কমিটির সভানেত্রী জোবেদা খানম, সহকারী সভানেত্রী সৈয়দা শাহের বানু চৌধুরী, সম্পাদিকা লুৎফুন্নেসা খাতুন, রাবেয়া খাতুন, জাহানারা মতিন, রোকেয়া বেগম, সামসি কাইসার রশীদ, নুরজাহান বেগম, সুফিয়া খাতুন, মাহমুদা খাতুন প্রমুখ।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিস' গঠিত হয়। সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল জাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখা। 'তমদ্দুন মজলিস' গঠিত হবার পরে সংগঠনের পক্ষে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। যা তখনকার বাংলাভাষী সচেতন জনগোষ্ঠীর মনে ভাষার প্রশ্নে ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছিল।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সকল দাবি নাকচ করে দিলে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। ১১ মার্চ ডাকা হল সাধারণ ধর্মঘট আর এখানেও সম্পৃক্ত ছিলেন জাগ্রত নারীসমাজ, যাদের মধ্যে অন্যতম নিবেদিতা নাগ, নাদেরা বেগম, লিলি খান, লায়লা সামাদ প্রমুখ। ১৯৪৭-১৯৫১– মাত্র চার বছরের ব্যবধানে ভাষা আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৮০-৮৫ জন। এ ছাত্রীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে ভাষা আন্দোলনে গৌরবময় ভূমিকা রেখে গেছেন। সেই সময় ড. শাফিয়া খাতুন ছিলেন ওমেন স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সহসভাপতি। ১৯৫০-৫১-তে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওমেন হল ইউনিয়নের জি এস এবং পরবর্তী বছর ভিপি নির্বাচিত হন। ভাষা আন্দোলন সংঘটিত করতে তিনিও বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। চট্টগ্রামে ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি থেকে কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এতে যুক্ত হন চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী প্রতিভা মুৎসুদ্দী। ২১ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন সৈয়দা হালিমা রহমান, চিনা বিশ্বাস, প্রতিভা মুৎসুদ্দী, শেলী দস্তিদার, প্রণতি দস্তিদার, মীরা, জুলেখা, মিনতিসহ অনেকে। পরবর্তীকালে ঢাকায় ছাত্র মিছিলের উপর গুলিবর্ষণে ছাত্র হত্যার খবর পেয়ে বিকেল তিনটায় আবারো রাজপথে নেমে আসে ছাত্রছাত্রীরা। প্রতিভা মুৎসুদ্দী ও তালেয়া রহমান মিছিল নিয়ে আসেন ডা. খাস্তগীর স্কুলের সামনে। ওখান থেকে গাড়িতে চড়ে 'মন্ত্রিসভার পদত্যাগ চাই', 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই'-এ সব স্লোগানে সারা শহর প্রদক্ষিণে নেতৃত্বে ছিলেন দশম শ্রেণীর ছাত্রী হালিমা খাতুন, রওশন আরা রহমানসহ অনেকে। চট্টগ্রামের ইতিহাসে নারীদের এ ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শন ছিল সেই প্রথম।

১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' কর্তৃক আয়োজিত প্রথম সম্মেলনের নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। এ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ঢাকার ইডেন কলেজের ছাত্রী মাহবুবা খাতুন। তিনি বলেন, 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি স্বীকার করিয়ে নেয়ার জন্য আবশ্যক হলে মেয়েরা রক্ত বিন্দু পর্যন্ত বিসর্জন দেবে।'

২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙার ক্ষেত্রে বিতর্ক উঠলে সেদিনও ছাত্রীরা পক্ষে মত দিয়েছিল। সেদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে মেয়েরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আমতলার সভায় যোগ দিতে এসেছিল। পুলিশি হামলার আশঙ্কায় ছাত্রীদের মিছিল না করার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিছিলে নারীরা হেঁটেছিল, ছিল অগ্রবাহিনী হিসেবে। বেলা ১১টা নাগাদ হাজারো ছাত্র-ছাত্রীর 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে মুখরিত পুরো ক্যাম্পাস। এ সময়ে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে মুক্তি পেয়েই ভাষা আন্দোলনে আবারো সক্রিয় হন নাদেরা বেগম। ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে সিদ্ধান্ত হলে ভাষা সংগ্রামী গাজীউল হকের সভাপতিত্বে মিছিল বের হতে শুরু করে। প্রথম মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন হাবিবুর রহমান এবং চতুর্থ মিছিলের চার লাইনে চারজন করে অংশগ্রহণে রাজপথে নেমে আসেন মেয়েরা। সাদিয়ার নেতৃত্বে সুফিয়া ইব্রাহীম, রওশন আরা বাচ্চু, হালিমা খাতুন, নাদেরা বেগম, ফিরোজা বেগম, বেগম শামসুন্নাহার, সোফিয়া করিম, সারা তৈফুর, জোহরা আরা, ডা. শরিফা খাতুন, সুফিয়া আহমেদ, মোসলেমা খাতুন, আমেনা আহমেদ, স্কুলছাত্রী জুলেখা, আখতারী পারুলসহ জানা-অজানা অনেকে। এ সময় পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হন রওশন আরা বাচ্চু। গ্রেপ্তার হন ফরিদা বারী, কামরুনাহার লাইলী, ফিরোজা বেগম, জহরত আরা রাহেলা, জোহরা আরা, সুরাইয়া, নুরুন্নাহার, সালেহা খাতুন, সাজেদা আলী প্রমুখ।

ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যারা তমদ্দুন মজলিসের সাথে যুক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আনোয়ারা খাতুন। তিনি ছিলেন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং বায়ান্নর ভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য। পুলিশের গুলিতে ছাত্রহত্যা ও নারী

নিপীড়নের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য আনোয়ারা খাতুন ২১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বিধান পরিষদে বলেন 'মি. স্পীকার, ঘটনা দেখে মনে হয়, আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা পাইনি। তার প্রমাণ এ পুলিশী জুলুম। এ অত্যাচার থেকে মেয়েরা পর্যন্ত রেহাই পায় নাই।... যে জাতি মাতৃজাতির সম্মান দিতে জানে না সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। এ অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়... মিলিটারিরা মেয়েদের গাড়ি করে নিয়ে কুর্মিটোলায় ছেড়ে দিয়েছে...আমি তাদের দুজনার নাম দিচ্ছি– যারা আহত হয়েছে– একজন হলো ঢাকা হাইকোর্টের জাস্টিস ইব্রাহিম সাহেবের মেয়ে মিস সুফিয়া ইব্রাহিম। আর একজন মিস রওশন আরা...'।

ভাষা আন্দোলনের এক পর্যায়ে মর্গান স্কুলেরই ছাত্রী মতিয়া চৌধুরী নিজের আঙ্গুল কেটে রক্ত দিয়ে 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' ব্যানার লিখেন। একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার প্রতিবাদে টাঙ্গাইলে সমাবেশের আয়োজন করেন নাজমা বেগম, নুরুন্নাহার শেলী, রওশন আরা ইউসুফ প্রমুখ এবং ময়মনসিংহে ড. হালিমা খাতুন ও অন্যান্য। ২১ ফেব্রয়ারিতে সংঘটিত নৃশংসতার প্রতিবাদে অভয় দাশ লেনে নেতৃত্ব দেন বেগম সুফিয়া কামাল ও নুরজাহান মুরশিদ। ধর্মঘট উপলক্ষে প্রচুর পোস্টার ও ব্যানার লেখার দায়িত্ব পালন করেন ড. সাফিয়া খাতুন ও নাদিরা চৌধুরী। নারী ভাষা সংগ্রামীদের মধ্যে আবুল কাশেমের স্ত্রী রাহেলা, বোন রহিমা এবং রাহেলার ভাইয়ের স্ত্রী রোকেয়া আন্দেলনকারী ছাত্রদের আজিমপুরের বাসায় দীর্ঘদিন রান্না-বান্না করে খাইয়েছেন।

ঢাকার বাইরে নারীরা ভাষা আন্দোলনে একাত্ম হতে গিয়ে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নারায়ণগঞ্জে মমতাজ বেগম কারাভোগ করেন। শুধু তাই নয় সরকারের চাপে স্বামী তাকে তালাক দিতে বাধ্য হন। মমতাজ বেগমের ছাত্রী ইলা বকশী, রেণু ধর ও শাবানীর মত কিশোরীকেও গ্রেফতার করা হয়। ময়মনসিংহ মুসলিম স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী সাহেলা বেগম ভাষা শহীদদের স্মরণে স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলন করায় সরকারের চাপে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কার করে। ওইখানেই সালেহা বেগমের শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটে। ২২ ফেব্রুয়ারির শোক মিছিল ও ২৩ ফেব্রুয়ারি হরতালসহ প্রতিটি কর্মসূচিতে নারীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে ইডেন কলেজের শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনার গড়ে তোলে। আর বর্তমানে যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, সেই নকশার সঙ্গে মিশে আছে নারী ভাস্কর নভেরা আহমেদের নাম। ভাষার দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার পরিণতি লাভ করতে লেগেছিল প্রায় এক দশক।

চট্টগ্রামে বেশ কিছু কলেজছাত্রী এবং ভদ্র মহিলা ভাষা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম তোহফাতুন্নেছা আজিম, সৈয়দা হালিমা, সুলতানা বেগম, নুরুন্নাহার জহুর, আইনুন নাহার, আনোয়ারা মাহফুজ, প্রতিভা মুৎসুদ্দি। খুলনাতে কাজ করেছেন তমদ্দুন মজলিসের কর্মী আনোয়ারা বেগম, সাজেদা আলী এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীরা। সাতক্ষীরায় সক্রিয়ভাবে এ আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন গুলআরা বেগম ও সুলতানা চৌধুরী। টাঙ্গাইলে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন নুরুন্নাহার বেলী, রওশন আরা শরীফ। রংপুরে এ সময় মহিলারা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে মিছিলে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছিলেন। তারা হচ্ছেন নিলুফা আহমেদ, বেগম মালেকা আশরাফ, আফতাবুন্নেছা প্রমুখ। রাজশাহীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ড. জাহানারা বেগম বেনু, মনোয়ারা বেগম বেনু, ডা. মহসিনা বেগম, ফিরোজা বেগম ফুনু, হাফিজা বেগম টুকু, হাসিনা বেগম ডলি, রওশন আরা, খুরশিদা বানু খুকু, আখতার বানু প্রমুখ।

১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহিদ বেদিতে এদেশের ছাত্রসমাজ যাতে শ্রদ্ধা জানাতে না পারে, সে জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। সেদিন ঘটে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীরাও ১৪৪ ধারা ভেঙে রাজপথে নেমে এলে প্রায় ২০-২১ জন ছাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রীদের গ্রেফতারের ঘটনায় জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং সরকারের টনক নড়ে। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের সংবিধানে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়া নারীদের প্রায় সবাই মারা গেছেন। তবে বহুদিন পরে হলেও ২০১৭-এ একুশে পদক পান অধ্যাপক শরিফা খাতুন ভাষা আন্দোলনে অবদান রাখার জন্য। ছাত্রী অবস্থাতেই তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

ভাষা আন্দোলনে সুপ্ত ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ। এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী নারীদের পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়নি আজও। নানা রচনায় বা ইতিহাসে এভাবেই নারীরা উপেক্ষিত হয়েছেন বারে বারে। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই বাঙালি নারীরা এই ভূখণ্ডে আজকের অবস্থানে এসেছে। ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস সঠিকভাবে জানা ও তা নতুন প্রজন্মকে জানানো আজ আমাদের নৈতিক দায়ের মধ্যে পড়ে। সেই দায় যদি আমরা শোধ করতে পারি, তবেই আমাদের আগামী প্রজন্ম তাদের বোনদের কীর্তিগাথা শুনে গৌরব বোধ করবে। নারী ভাষা সংগ্রামীদের আর উপেক্ষা নয়। নারী ভাষাসংগ্রামীসহ প্রত্যেক ভাষা শহীদ ও সংগ্রামীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান কেবল দাবি নয়, অপরিহার্য প্রয়োজন।

ঈমাম হোসাইন
প্রাবন্ধিক, কথাশিল্পী

একুশের প্রভাতফেরির নেতৃত্ব দিচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান

প্রবন্ধ

একুশের গান
এবং আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

এম আবদুল আলীম

'ভুলব না, ভুলব না/একুশে ফেব্রুয়ারী, ভুলব না', 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলি ও বাঙ্গালী– রে ভাইরে' কিংবা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙা একুশে ফেব্রুয়ারী'–একুশের চেতনার শাণিত এমন অজস্র অমর পঙ্‌ক্তি একুশের গানের মর্যাদা লাভ করেছে। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন তথা একুশের চেতনা বাঙালির জীবনকে কত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, এ গানগুলো তার প্রমাণ। কবিতা, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাসের মতই গানের মধ্যেও একুশের চেতনার রূপায়ণ ঘটেছে অনিবার্যভাবে। গীতিকারদের সংবেদনশীল মন মাতৃভাষা বাংলার অপমান সইতে পারেনি। মাতৃভাষার গৌরব, বাংলা ভাষার প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অবজ্ঞা, ভাষা-আন্দোলনকারীদের উপর জুলুম-নির্যাতন এবং বাংলা মায়ের সন্তানদের আত্মত্যাগের বিষয়টিকে তাঁরা গভীর মমতায় তুলে ধরেছেন গানের কথা, সুর, তাল ও লয়ে।

অসংখ্য মরমি সাধক, কবি এবং গীতিকার একুশের গান রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– আনিসুল হক চৌধুরী, সত্যেন সেন, গাজীউল হক, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, জসীম উদ্‌দীন, হাসান হাফিজুর রহমান, তোফাজ্জল হোসেন, নাজিম মাহমুদ, আলিমুজ্জামান চৌধুরী, আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, সিকান্দার আবু জাফর, সিরাজুল ইসলাম, কাজী লতিফা হক, নরেন বিশ্বাস, দিলওয়ার, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, আবিদ আনোয়ার, বদরুল হাসান, জাহিদুল হক, নাসির আহমেদ, মতলুব আলী, শাফাত খৈয়াম, মুহাম্মদ মুজাক্কের, এস এম হেদায়েত, আজাদ রহমান, নজরুল ইসলাম বাবু, আবুবকর সিদ্দিক, সৈয়দ শামসুল হুদা, ফজল-এ-খোদা, হামিদুল ইসলাম, মুন্সী ওয়াদুদ, ইন্দু সাহা, হাবীবুর রহমান, আসাদ চৌধুরী, জেব-উন্-নেসা জামাল, মাসুদ করিম, আজিজুর রহমান, আজিজুর রহমান আজিজ, কে জি মোস্তফা, আবদুল হাই আল হাদী, নূরুজ্জামান শেখ প্রমুখ। একুশের গানের সুরকারদের মধ্যে রয়েছেন–আলতাফ মাহমুদ, আবদুল লতিফ, মোমিনুল হক, নিজাম উল হক, সমর দাস, সত্য সাহা, সাধন সরকার, আজাদ রহমান, আবদুল আহাদ, শেখ লুৎফর রহমান, খোন্দকার নূরুল আলম, অজিত রায়, লোকমান হোসেন ফকির, আবদুল জব্বার, খান আতাউর রহমান, প্রশান্ত ইন্দু, রমেশ শীল, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, কবিয়াল ফণী বড়ুয়া, আবেদ হোসেন খান, দেবু ভট্টাচার্য, বশির আহমেদ, রাম গোপাল মোহান্ত, সুখেন্দু চক্রবর্তী, হরলাল রায় প্রমুখ। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের অনেক পূর্বে আবির্ভূত হলেও মরমি কবি লালন সাঁই (১৭৭৪-১৮৯০), দুদ্দু শাহ (১৮৪১-১৯১১) এবং গীতিকবি অতুল প্রসাদ সেন বাংলা ভাষা নিয়ে গান রচনা করেছেন। বাংলা ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব সবার আগে, এ উপলব্ধি থেকে লালন সাঁই উচ্চারণ করেছিলেন : 'বাংলা শিক্ষা কর মন আগে/ইংরেজিতে মন তোমার রাখ বিভাগে।' দুদ্দু শাহ বলেছিলেন : 'মাতৃভাষা ত্যজে সবাই/আরবি ভাষা শিখলে রে ভাই/তাতে ভাই ফায়দা তো নাই ॥' বাংলা ভাষা নিয়ে রচিত অতুল প্রসাদ সেনের অমর সংগীত: 'মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা।'

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষা বাদ দেওয়া শুরু করলে এবং পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা ভাষাবিষয়ক প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজ তার প্রতিবাদ জানায়। শুরু হয় ভাষা-আন্দোলন। এর আগে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বাদানুবাদ শুরু হয় রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীমহলে।

ভাষা-আন্দোলনের প্রথম পর্বেই অর্থাৎ আটচল্লিশ থেকেই এ নিয়ে গান রচনা শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে সর্বপ্রথম একুশের গান রচনা করেছিলেন আনিসুল হক চৌধুরী। গানটির সুর দিয়েছিলেন গণসংগীত শিল্পী শেখ লুৎফর রহমান। গানটির কথা:

'ওরে ভাইরে ভাই
বাংলাদেশে আর বাঙালি নাই...
শোনেন হুজুর–
বাঘের জাত এই বাঙালেরা
জান দিতে ডরায় না তারা
তাদের দাবী বাংলা ভাষা
আদায় করে নেবেই।'

তিনি একুশকে নিয়ে আরও কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গানগুলো ছিল:

'বাংলার বুকের রক্তে রাঙানো আটই ফাল্গুন
ভুলতে কি পারি শিমুলে পলাশে হেরি
লালে লাল খুন'

এবং

'বাংলাদেশ আর বাংলা ভাষা যখন একই নামের সুতোয় বাঁধা।'

অনুসন্ধান করলে জানা যায়, একুশ নিয়ে অজস্র গান রচিত হয়েছে। সেসব গানে একুশের চেতনা যেমন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, তেমনি একুশের শহিদ ও বাংলা ভাষার প্রতি গভীর দরদ উছলে পড়েছে। ভাষা কিংবা ভাষা-আন্দোলন ব্যাপক তরঙ্গ তুলেছিল, দূর-শহরের ভাষার সংগ্রাম, প্রত্যন্ত মরমিসাধকের চেতনাতেও নাড়া দিয়েছে, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে গান বেঁধেছেন তাঁরা, কেউ কেউ গ্রাম থেকে শহরে এসে ভাষার গান গেয়ে জনসাধারণকে উজ্জীবিত করেছেন।

বাগেরহাটের চারণকবি সামছুদ্দীন আহমেদ (১৯১৫-১৯৭৪) রচিত 'রাষ্ট্র ভাষা গান' নামের অমর গানটি ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বাগেরহাট টাউন ক্লাবে সর্বদলীয় সমাবেশে স্বকণ্ঠে গেয়ে ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন। প্রথমে সামছুদ্দিন আহমেদ লোকগানের সুরে নিজেই গানটির সুর দিয়েছিলেন, পরে আলতাফ মাহমুদ নতুনভাবে সুরারোপ করেন এবং কণ্ঠ দেন রথীন্দ্রনাথ রায়। ব্যাপক জনপ্রিয় এই গানটিতে তিনি বলেন:

'রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন করিলি ও বাঙ্গালী–
রে ভাইরে
ঢাকার শহর রক্তে ভাসালী–
যাহা হইত পূর্ব্ব বাংলায় জিন্না লিয়াকত
বেছে বেছে মারা হইল জাতির ভবিষ্যত।
রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে এই এইতো তাদের গান–
ন্যায্য দাবী করিয়া ভাইরে খুয়াইলী পরাণ।
ইংরাজযুগে হাঁটুর নীচে চালাইত গুলি
স্বাধীন দেশে ভাইতে ভাইয়ের উড়ায়
মাথার খুলি।
তোতা পাখী পড়তে এসে খুয়াইলী পরাণ
মায় সে জানে বেটার দরদ যার কল্‌জের জান্।
মাও কান্দে বাপও কান্দে, কান্দে জোড়ের ভাই।'

এসব উদাহরণ থেকে বলা যায়, ঢাকা তথা শহরকেন্দ্রিক প্রধান প্রধান কবি ও গীতিকারদের পাশাপাশি বাংলার পল্লি অঞ্চলের লোককবিরাও একুশের গান রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন। গণ-কবিয়াল রমেশ শীল 'জাতীয় আন্দোলন' নামের দীর্ঘ কবিতায় পলাশী থেকে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত ইতিহাসের নানা ঘটনা তুলে ধরতে গিয়ে ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন: '১৯৫২ সন বাংলা ভাষা-আন্দোলন সফিক বরকত জব্বার সালাম মরে।' ৫২-র ভাষা-অন্দোলনের অব্যবহিত পরে রমেশ শীল রচনা করেন 'ভাষার গান' (১০ মে, ১৯৫২)। এতে তিনি মাতৃভাষার বন্দনা যেমন গাইলেন, তেমনি ভাষা-শহিদদের স্মরণ করলেন শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতায়:

'স্মরণীয় দিন বাঙালীর স্মরণীয় দিন।
রমনার মাটি ছাত্র রক্তে লাল হয়ে গেল এই দিন ॥
যত হিংসুকের দলে, মাকে ছাড়ি বিমাতাকে
মা ডাকতে বলে।
আমরা নিজের মাকে মা ডাকিলে
তারা করে মুখ মলিন ॥
ছাত্ররা দাবী জানাইল,
কোন পরাণে কচি বুকে গুলি চালাইল।
তেমনি দুষ্কার্য্যের ফল ফলিয়া শক্তিবান
হইল শক্তিহীন ॥
শুন ভাই-ভগিনীগণ,
বাঙালির বাংলা ভাষা মার দুধের মতন।
ভাষা গেলে জাতির মরণ,
জল গেলে বাঁচে না মাছ ॥
ভাষা জাতির মহাধন,
মুখের ভাষা রাখতে যারা দিয়াছে জীবন।
এই শহীদ স্মৃতি রাখব স্মরণ
দেহে জীবন যতদিন ॥'

কবিয়াল বিজয় সরকারও একুশের গান রচনা করেছেন। মাতৃভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হলে জাতির আত্ম-উন্নয়নের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এমন বোধ থেকেই তিনি লিখেছিলেন:

'মলিন হ'লে মাতৃভাষা, জীবন বৃদ্ধির নাহি আশা,
ব্যর্থ হয় আত্ম-উন্নয়নে।'

তিনি ভাষা-আন্দোলনকে ধর্মযুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করে ভাষা-শহিদদের 'জান্নাতের ফুলবনে' জায়গা দেওয়ার জন্য 'বিশ্বপতি'র কাছে মিনতি করেছেন। বাংলা ভাষার গর্বে বুক ফুলিয়ে একুশের গান রচনা করে কবিয়াল বিজয় সরকার লিখেছেন:

'বাংলাদেশের মানুষে, ফেব্রুয়ারী একুশে,
ভুলিতে পারে না জীবনে,
ভাষা আন্দোলনের জন্য, জনসমাজ হল বিপন্ন,
কুখ্যাত সরকারের শাসনে ॥
বাংলাদেশের কি দুর্দশা, উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা,
কোনও আশাভরসা দেখিনে;
মলিন হ'লে মাতৃভাষা, জীবনবৃদ্ধির নাহি আশা,
ব্যর্থ হয় আত্ম-উন্নয়নে ॥
যে ভাষাতে দেখি স্বপ্ন,
যে ভাষাতে কই মনের গোপন
স্মরণ মনন চলে যে ভাষণে,
যে ভাষায় জাতীয় কৃষ্টি, জ্ঞানবিজ্ঞান
ইতিহাস সৃষ্টি,
শনির দৃষ্টি পড়ল কুক্ষণে ॥
তাই বুঝে বাংলার নওজোয়ান,
রাখিতে বাংলা ভাষার মান,
ধর্মযুদ্ধ করিল প্রাণপণে,
রেখে গেছে হাসিমুখে, রক্তলেখা মাটির বুকে,

মুছিবে না সহস্র প্লাবনে ॥
মোদের সালাম, রফিক, বরকত, সফিক, আরো যত দেশপ্রেমিক
বিজয়ী বীর বিদিত ভুবনে।
জানিল এই বিশ্ববাসী, বাঙালী নয় পর প্রত্যাশী,
মরতে জানে উদ্দেশ্য সাধনে ॥
দিয়েছে প্রাণের বিনিময়, বাংলা ভাষা চির অক্ষয়,
রক্ত রঙিন অক্ষরের লিখনে,
পৃথিবী বুঝিল স্পষ্ট, বাংলা ভাষার কি বৈশিষ্ট্য,
মান পেয়েছে শ্রেষ্ঠ আসনে ॥
রাখিতে বাংলার ভাবধারা, আত্মদান করিল যারা,
তাদের তরে প্রার্থনা কায়মনে,
পাগল বিজয় বলে বিশ্বপতি,
করিও তাদের সদ্‌গতি
রেখ তাদের জান্নাতের ফুলবনে॥'

ভাষাশহিদদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি, তাঁরা ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। কবিয়াল বিজয় সরকার সেই অমর শহিদদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:
'রেখে গেছে হাসি মুখে, রক্তলেখা মাটির বুকে,
মুছিবে না সহস্র প্লাবনে।'

এছাড়া সামছুদ্দীন আহমেদ, রমেশ শীল, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, শাহ আবদুল করিম, মহিন শাহ, আবদুল হালিম বয়াতি, মাতু শাহ, কবিয়াল ফণী বড়ুয়া একুশের গান রচনা করে বাংলার হাট-বাজার ও গ্রাম-গঞ্জের পথে-প্রান্তরে আবেগ-মোথিত সুরে গেয়ে জনসাধারণকে উজ্জীবিত করেছেন। একুশের গান রচনার জন্য অনেককে জেল-জুলুম ও পুলিশি হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। চিরায়ত বাংলার এই লোককবিদের রচিত একুশের গানের কয়েকটি পঙক্তি:
১. 'বাংলা আমার মায়ের ভাষা এমন ভাষা আর যে নাই
এ ভাষাতে মা-কে ডাকি ডেকেছে মোর সালাম ভাই।' (মোহাম্মদ মাতু মিয়া);
২. 'সালাম আমার শহীদ স্মরণে
দেশের দাবি নিয়া দেশপ্রেমে মজিয়া
প্রাণ দিলেন যেসব বীর সন্তানে।'
(শাহ আবদুল করিম);
৩. 'ভাষার জন্য জীবন হারালি
বাঙালি ভাইরে ভাষার জন্য জীবন হারালি।' (রমেশ শীল);
৪. 'অমি বাংলা ভালবাসি,
আমি বাংলার বাংলা আমার ওতপ্রোত
মেশামেশি।' (রমেশ শীল);
৫. 'বাংলাদেশের মানুষ, ফেব্রুয়ারি একুশে ভুলিতে পারবে না জীবনে
ভাষা আন্দোলনের জন্য জনসমাজ হলো বিপন্ন
কুখ্যাত সরকারের শাসনে।' (বিজয় সরকার);
৬. 'শোন দেশের ভাই-ভগিনী
শোন আচানক কাহিনী
কান্দে বাংলা জননী ঢাকা শহরে।'
(হেমাঙ্গ বিশ্বাস);
৭. 'কাইন্দ না মা কাইন্দ না বঙ্গজননী
তুমি যে বীর প্রসবিনী গো তুমি শহীদ জননী।' (হেমাঙ্গ বিশ্বাস)

বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার পর প্রথম গান রচনা করেছিলেন ভাষাসংগ্রামী গাজীউল হক। এটিই ছিল তখনকার দিনের রাজপথের গান। এই গানটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সবাই এটি গাইত। গানটির সুর দেয়া হয়েছিল হিন্দিগান 'দূর হাঁটো দূর হাঁটো। ঐ দুনিয়াওয়ালে, হিন্দুস্তান হামারা হায়'-এর অনুকরণে। সুর দিয়েছিলেন তাঁর অনুজ নিজাম উল হক। গানটির কথা ছিল এ রকম:
'ভুলবো না, ভুলবো না,
এই একুশে ফেব্রুয়ারী ভুলবো না।
লাঠিগুলি, টিয়ার গ্যাস, মিলিটারী
আর মিলিটারী ভুলবো না ॥
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই–এই দাবীতে ধর্মঘট,
বরকত সালামের খুনে লাল ঢাকার রাজপথ,
ভুলব না ॥
স্মৃতিসৌধ ভাঙ্গিয়াছে জেগেছে পাষাণে প্রাণ,
মোরা কি ভুলিতে পারি খুনরাঙা জয় নিশান?
ভুলব না।'

এছাড়া গাজীউল হক আরেকটি একুশের গান রচনা করেছিলেন। গানটির কথা ছিল:
'শহীদ তোমায় মনে পড়ে, তোমায় মনে পড়ে।
তোমার কান্না তোমার হাসি আমার চোখে ঝরে।'

একুশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গানের রচয়িতা ভাষাসংগ্রামী আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শহিদদের রক্তাক্ত দেহ দেখে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী রচনা করেন 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' শীর্ষক কবিতা।

একুশের বেশকিছু কালজয়ী গানের রচয়িতা অনন্য সুরশিল্পী আবদুল লতিফ। তাঁর 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়,
ওরা কথায় কথায় শিকল পরায়
আমার হাতে পায়– গানে প্রকাশিত হয়েছে 'বাঙালির সম্মিলিত প্রতিবাদী চেতনা, বাংলার হাজার বছরের গৌরবগাথা।'

একুশসংক্রান্ত তাঁর অন্য গানগুলো হল:
'বুকের খুনে রাখলো যারা
মুখের ভাষার মান
ভোলা কি যায়রে তাদের দান?',
'আমি কেমন কইরা ভুলি
মুখের কথা কইতে গিয়া
ভাই আমার খাইছে গুলি।',
'রফিক-শফিক-বরকত নামে
বাংলা মায়ের দুরন্ত কটি ছেলে।
স্বদেশের মাটি রঙিন করেছে
আপন বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে',
'আবার এসেছে অমর একুশে
পলাশ ফোটানো দিনে,
এদিন আমার ভায়েরা আমায় বেঁধেছে রক্তঋণে।'

একুশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গানের রচয়িতা ভাষাসংগ্রামী আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শহিদদের রক্তাক্ত দেহ দেখে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর মনে যে গভীর ভাবের উদয় হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রচনা করেন 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' শীর্ষক কবিতা। প্রথমে সেটির সুরারোপ করেন সুরকার আব্দুল লতিফ, পরবর্তীকালে সুরকার আলতাফ মাহমুদের সুরে সেটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং প্রভাতফেরি তথা একুশের প্রধান গান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। গানটির কথা ছিল এ রকম:
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্ত রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি ॥
জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা
জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রেখে
মানুষের দাবী
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে
তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে
শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ॥
সেদিনো এমনি নীল গগনের বসনে
শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে;
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকনন্দা যেনো,
এমন সময় ঝড় এলো এক,
ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো ॥
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের,
ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে
দেশের দাবীকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ॥
তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো
একুশে ফেব্রুয়ারী
আজো জালিমের কারাগারে মরে
বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে
আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারী
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ॥'

বায়ান্ন-উত্তরকালে এ গান হয়ে ওঠে বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয়, বাঙালির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্মারক। এ গান রচনা প্রসঙ্গে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী লিখেছেন: '১৯৫২ সাল একুশে ফেব্রুয়ারী বিকেলে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের বারান্দায় শহীদ বরকতের রক্তমাখা

অমর ২১ শে ফেব্রুয়ারি

লাশ দেখে এই গানের প্রথম দুটি লাইন আমার মনে জেগে ওঠে। পুরো গানটি অবশ্য লিখেছি দু' একদিন পরে ধীরে ধীরে।' আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী একুশ নিয়ে আরও কয়েকটি গান রচনা করেছেন, সেগুলো হল:

'রক্তে আমার আবার প্রলয় দোলা
ফাল্গুন আজ চিত্ত আত্মভোলা
আমি কি ভুলিতে পারি
একুশে ফেব্রুয়ারি',
'শহীদ মিনার ভেঙেছো
আমার ভাইয়ের রক্তে গড়া
দ্যাখো বাংলার হৃদয় এখন শহীদ মিনারে ভরা...
এত রক্তের প্রাণকল্লোল সাগরে দেবেই ধরা।'

একুশের অমর গানের রচয়িতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর জন্ম ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৪, জন্মস্থান বরিশালের উলানিয়ায়। পিতা ওয়াহিদ রেজা চৌধুরী, মাতা মোসাম্মৎ জহুরা খাতুন। লেখাপড়া শুরু উলানিয়া জুনিয়র মাদ্রাসায়। এরপর ভর্তি হন আসমত আলী খান ইনস্টিটিউটে। ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। এ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ১৯৫৩ সালে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। ১৯৫৮ সালে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং পরে লাভ করেন স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী স্কুলজীবনেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তখন তিনি ছাত্র কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন। ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগে যোগদান করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফজলুল হক হল ছাত্র-সংসদের সদস্য ছিলেন। ষাটের দশকের স্বাধিকার সংগ্রাম এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখেন। ১৯৭১ সালে সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা' পত্রিকা এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু ১৯৪৭ সালে দুর্গামোহন সেন সম্পাদিত 'কংগ্রেস হিতৈষী' পত্রিকায় চাকরির মাধ্যমে। ১৯৫০ সালে যোগ দেন দৈনিক 'ইনসাফ' পত্রিকায়। ১৯৫০ সালে অনুবাদক হিসেবে যোগ দেন দৈনিক সংবাদ পত্রিকায়। পরবর্তীকালে দৈনিক সওগাত, দিলরুবা, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী, দৈনিক জেহাদ'র বার্তা, দৈনিক সোনার বাংলা, দৈনিক আওয়াজ, দৈনিক পূর্বদেশ, জয় বাংলা বাংলার ডাক, সাপ্তাহিক জাগরণ প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি ও দায়িত্ব পালন করে। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে রয়েছে নকীব, চাবুক, মেঘনা, দৈনিক জনপদ, নতুন দিন, পূর্বদেশ প্রভৃতি। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখেন। ভাষা-আন্দোলনের পূর্বাপর ইতিহাস নিয়ে রচিত তাঁর প্রবন্ধ 'একুশকে নিয়ে কিছু স্মৃতি: কিছু কথা'।

১৯৫২ সালে ঢাকা কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি ভাষা-আন্দোলনে যুক্ত হন। এ বিষয়ে তাঁর বিনয়ী স্বীকারোক্তি: '১৯৫২ সালে আমি ছিলাম ভাষা আন্দোলনের একজন নগণ্য কর্মী।' ১৯৫৫ সালে সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ২১শে ফেব্রুয়ারি পালন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন এবং একমাস কারানির্যাতন ভোগ করেন। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে জোট নিরেপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ছাত্রজীবনেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর প্রথম গল্প ১৯৪৯ সালে সওগাত পত্রিকায় ছাপা হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল– কৃষ্ণপক্ষ (১৯৫৯), সম্রাটের ছবি (১৯৫৯), সুন্দর হে সুন্দর (১৯৬০), চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান (১৯৬০), নাম না জানা ভোর (১৯৬২), নীল যমুনা (১৯৬৪), শেষ রজনীর চাঁদ (১৯৬৭), ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা (১৯৯৪), পলাশী থেকে ধানমন্ডি, আমরা বাংলাদেশী না বাঙালি? (১৯৯৩) প্রভৃতি। কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ করেছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৭), একুশে পদক (১৯৮৩), ইউনেস্কো পুরস্কার, সংহতি আজীবন সম্মাননা পদক (২০০৮), স্বাধীনতা পদক (২০০৯), বঙ্গবন্ধু পুরস্কার, মানিক মিয়া পদক (২০০৯), যুক্তরাজ্যের ফ্রিডম অফ বারা উপাধি প্রভৃতি। বর্তমানে তিনি লন্ডনে বসবাস করেন।

একুশের গান সুরপাগল বাঙালিকে উজ্জীবিত করেছে, ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার দীপ্ত প্রকাশ ও বিকাশে সহায়তা করেছে। শুধু তাই নয়, মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ বাঙালির চেতনায় এই গানগুলো প্রজ্বালিত করেছিল চিরায়ত বাঙালিত্বের অগ্নিমশাল। ভাষা-আন্দোলনের সময় যেমন তেমনি পরবর্তীকালে এই গানগুলো একুশের চেতনা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ পর্যন্ত একুশের গানগুলো যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সংকলন করা হয়নি। জাতির প্রয়োজনেই গানগুলো যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সংকলন জরুরি।

এম আবদুল আলীম
শিক্ষাবিদ, গবেষক-প্রাবন্ধিক

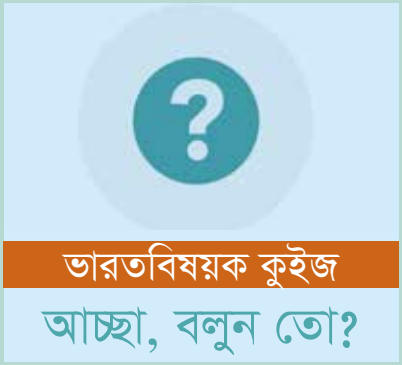

ভারতবিষয়ক কুইজ

আচ্ছা, বলুন তো?

১. ভারতের কোন শহর চামড়া নগরী নামে পরিচিত?
ক. আহমেদাবাদ
খ. অমৃতসর
গ. লক্ষ্ণৌ
ঘ. কানপুর

২. কোনটি ভারতের ম্যানচেস্টার নামে প্রসিদ্ধ?
ক. পুনে
খ. কলকাতা
গ. আহমেদাবাদ
ঘ. নাগপুর

৩. ২০১১ সালের ১ মার্চ ভারতের জনসংখ্যা ছিল
ক. ১,০১০,১৯৩,৪২২
খ. ৯১০,১৯৩,৪২২
গ. ১,২১০,১৯৩,৪২২
ঘ. ১,৯১০,১৯৩,৪২২

৪. জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের বৃহত্তম নগরী
ক. দিল্লি
খ. মুম্বই
গ. চেন্নাই
ঘ. পুনে

৫. ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংখ্যা
ক. ২৭ রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
খ. ২৯ রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
গ. ২৭ রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
ঘ. ২৩ রাজ্য ও ১০টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

৬. ২০১১ সালের জনগণনার লিঙ্গ অনুপাত
ক. ৯৪০
খ. ৯৭২
গ. ৮৪৫
ঘ. ৭৭৪

৭. ভারতের জাতীয় জলজ প্রাণির নাম কি?
ক. নদীজ শুশুক
খ. কুমীর
গ. কাৎলা মাছ
ঘ. সবুজ ব্যাঙ

৮. কোন্ শতাব্দীতে ভারতে পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের আগমন ঘটে?
ক. ১৭শ
খ. ১৫শ
গ. ১৪শ
ঘ. ১৬শ

৯. নতুন দিল্লির ভারতীয় লোকসভার স্থপতি কে?
ক. গুস্তাভ আইফেল
খ. লি কর্বাসিয়েঁ
গ. এডুইন ল্যাঞ্চসিয়েঁ লুটিয়েঁ
ঘ. বোনান্না পিসানো

১০. বোম্বেতে রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরির আগমন উপলক্ষে নির্মিত স্মারকের নাম?
ক. ইন্ডিয়া গেট
খ. গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া
গ. ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস
ঘ. এলিফ্যান্টা কেভস্

১১. কত সালে কলকাতায় প্রথম মেট্রো রেল সার্ভিস চালু হয়?
ক. ১৯৮৪
খ. ১৯৯০
গ. ১৯৯২
ঘ. ১৯৯৫

১২. ভারতের প্রথম মহিলা ডাকঘর কোথায় অবস্থিত?
ক. দিল্লি
খ. মুম্বই
গ. চেন্নাই
ঘ. পাটনা

১৩. কত সালে মাদার টেরিজা নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
ক. ১৯৭৯
খ. ১৯৮০
গ. ১৯৮২
ঘ. ১৯৮৫

১৪. ভাবতে কত বছর পর পর জনগণনা হয় হয়?
ক. ৫ বছর
খ. ১০ বছর
গ. ১২ বছর
ঘ. ১৫ বছর

১৫. ভারতে কত সালে মারুতি উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৮১
খ. ১৯৮৫
গ. ১৯৮৯
ঘ. ১৯৯১

১৬. ভারতে কাকে 'মেট্রো ম্যান' বলা হয়?
ক. রঙ্গরাজন
খ. মন্টেক সিং আহলুওয়ালিয়া
গ. ই শ্রীধরণ
ঘ. রতন টাটা

১৭. কোন্টি ভারতের 'ডায়মন্ড সিটি'?
ক. আহমেদাবাদ
খ. চণ্ডিগড়
গ. হায়দ্রাবাদ
ঘ. সুরাট

১৮. কে ভারতের 'মিশাইল ওম্যান' নামে পরিচিত?
ক. কমল রণদিভে
খ. কল্পনা চাওলা
গ. টেসি টমাস
ঘ. জানকি আম্মল

১৯. কোন্ শহরে ভারতের জাতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ অবস্থিত?
ক. দিল্লি
খ. মুম্বই
গ. চেন্নাই
ঘ. কলকাতা

২০. কোন্টি ভারতের সবচেয়ে জনবহুল নগরী?
ক. দিল্লি
খ. মুম্বই
গ. চেন্নাই
ঘ. পুনে

২১. কত সালে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৮৬২
খ. ১৮৭৫
গ. ১৯৪৮
ঘ. ১৯৫০

২২. কোন্ রাজ্যে প্রথম ভ্যাট চালু হয়?
ক. মিজোরাম
খ. কেরালা
গ. হরিয়ানা
ঘ. মধ্য প্রদেশ

২৩. পলাশী যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?
ক. ১৭৫৭
খ. ১৭৮২
গ. ১৭৪৮
ঘ. ১৭৬৪

২৪. ত্রিপিটক কোন্ সম্প্রদায়ের পবিত্র গ্রন্থ?
ক. বৌদ্ধ
খ. সনাতন
গ. জৈন
ঘ. উপরের কোনওটি নয়

২৫. বৌদ্ধধর্মের ত্রিমুখী প্রতীক কিসের প্রতিনিধিত্ব করে না?
ক. নির্বাণ
খ. সংঘ
গ. বুদ্ধ
ঘ. ধম্ম

২৬. ব্রিটিশ আমলে ভারতের অর্থনৈতিক পাচার তত্ত্বের প্রবর্তক কে?
ক. জওহরলাল নেহরু
খ. দাদাভাই নওরোজী
গ. আর সি দত্ত
ঘ. এম কে গান্ধী

[উত্তর শেষ পাতায়]

নিবন্ধ

বসন্তোৎসব

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর তেরো পার্বণের শেষ হয় বসন্ত উৎসব আর হোলি উৎসবের মাধ্যমে। বাংলা বছর শেষের আগে রঙের উৎসব বসন্ত উৎসব প্রতিটা বাঙালির জীবনে যে আলাদাই এক রঙিন ছোঁয়া নিয়ে আসে তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। লিখেছেন পরমা

বসন্তোৎসব নিয়ে কিছু কথা

দুর্গাপুজো এড়িয়ে শারদোৎসব, বিশ্বকর্মাকে সম্মান দিয়ে শিল্পোৎসব– বাংলাভাষা ও সমাজে শান্তনিকেতন নতুন শব্দ ও ভাবনার সংযোজন করেছে। নববর্ষের দিন শ্রীগণেশ বা এলাহি ভরসা, আমপাতা-সিঁদুর-পঞ্জিকা, হালখাতা আর লাড্ডু ছাড়াও যে নববর্ষ পালন হতে পারে, সেটা শিখিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন। আজকের বাংলাদেশ সেই ধর্মীয়-অনুষঙ্গহীন অনুষ্ঠানকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান-বিবর্তন হল এই বসন্তোৎসব।

বসন্ত বরণ উৎসব

তখন থেকেই দেশ-বিদেশের নানা অতিথির পাশাপাশি উৎসবে সামিল করা হত আদিবাসীদেরও। সেই প্রথা আজও চলেছে। শান্তিনিকেতন উৎসবের, আনন্দের পরিচিত মুখ হলেও পৌষ উৎসব পেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই শান্তিনিকেতন অপেক্ষায় থাকে, কখন আসবে বসন্ত উৎসব? কখন আসবে ফালগুনের সেই পূর্ণিমা?

সকাল থেকেই শান্তিনিকেতনের রাস্তা রাঙা হয়ে ওঠে আবিরে। বিশ্বভারতী চত্বরই মূলত এই মূল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। সেখানে নৃত্যনাট্যের পাশাপাশি চলে নানা উৎসব। আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরা তো থাকেনই। তাছাড়াও থাকেন ভিনদেশি ছাত্রছাত্রীরাও। নেচে ওঠে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকরাও। এমনকী বিদেশিরাও।

হোলির দিনে যখন দিকে দিকে উদ্দামতা , শান্তিনিকেতনে তখন সুশৃঙ্খল আনন্দগান ও নাচের অনুষ্ঠান। সকালে সবাই গাইছে, 'ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল, লাগল যে দোল...। ধর্মের ছুঁতমার্গ, সামাজিক বিধিনিষেধ বা লোকাচারের বাড়াবাড়ি– এর কিছুই আসতে পারেনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে, শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসবে। এই উৎসব এখনও আন্তরিক, এখনও অমলিন আনন্দের উৎস।

ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো: শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব

বসন্ত উৎসব মানেই হাজার হাজার বাঙালির ঠিকানা শান্তিনিকেতন। রঙ আর আবিরে যেন রাঙ্গা হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন। সকাল থেকেই যেন উৎসবের চেহারা। বেজে ওঠে সেই চেনা গান– 'ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল, লাগল যে দোল' অথবা একেবারে শেষ মুহূর্ত– 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো'।

কেউ কেউ মনে করেন, ১৯০৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি, বসন্ত পঞ্চমীতে, শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে, যে ঋতু উৎসবের সূচনা হয়, তারই পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রূপ শান্তিনিকেতনের আজকের এই বসন্ত উৎসব বা বসন্তোৎসব। সরস্বতীর পূজার দিন শুরু হলেও পরবর্তী কালে সে অনুষ্ঠান বিভিন্ন বছর ভিন্ন ভিন্ন তারিখ ও তিথিতে হয়েছে। শান্তিনিকেতনের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রা বা অন্য আরও দিক মাথায় রেখে কোনও এক নির্দিষ্ট দিনে আশ্রমবাসী মিলিত হতেন বসন্তের আনন্দ অনুষ্ঠানে।

ক্ষিতিমোহন সেন এবং অন্য সঙ্গীদের নিয়ে সেবার রবীন্দ্রনাথ চিন যাত্রা করছেন দোলযাত্রার দিনে। সন্ধ্যায় পূর্ণিমার চাঁদ ও গঙ্গাতীরের গ্রামের কীর্তনের সুর তাঁকে আবেগাপ্লুত করে তুলেছিল। তাই হয়তো, শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব পূর্ণতা পায় রঙের উৎসব 'হোলি' বা 'হোরী' খেলার দিনে অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের 'দোলযাত্রা' তিথিতে। কিন্তু, শান্তিনিকেতনে কখনওই ধর্মীয় আচার অনুষঙ্গ অনুমোদন পায়নি। অথচ উৎসবের আনন্দে ঘাটতিও পড়েনি। কাজেই শান্তিনিকেতনে দোলের দিন যে ঋতু-উৎসবটি উদ্‌যাপিত হয়, তার সঙ্গে দোল বা হোলির ধর্মীয় অনুষঙ্গের কোনও যোগ নেই। এ হল ঋতু-উৎসব। সবার রঙে রং মিশাবার এক পরম নন্দন-প্রবর্তনাময় উপলক্ষ। দখিনা বাতাসে শান্তিনিকেতনের তরুশাখার ডালপালা সহসা উতলা হলেই সেকালে আশ্রমিকদের মনে গুনগুনিয়ে উঠত 'বসন্ত'। তার জন্য ফালগুনী পূর্ণিমা পর্যন্ত অপেক্ষাও বাহুল্য মনে হত সেকালে। কবির বালকপুত্র শমীন্দ্রনাথ ১৯০৭ সালে খেলাচ্ছলে যে ঋতু-উৎসবের সূচনা করেছিলেন, পাঁজি-পুঁথির হিসেব কষলে দেখা যায়, তা অন্তত দোলের দিন অনুষ্ঠিত হয়নি। তারপর কতবার ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে বসন্ত-উদ্‌যাপন হয়েছে আশ্রমে! বছরের বাঁধা একটা দিনে উৎসবেই তৃপ্ত হত না সে সময়ের আশ্রম। এই যেমন, ১৯২৩ সাল। সেবার মাঘী পূর্ণিমায় শান্তিনিকেতনে বসন্তের গানের আসর বসেছিল; আর ফালগুনী পূর্ণিমায় আশ্রম-সম্মিলনীর অধিবেশনে আবারও আয়োজন করা হয়েছিল বসন্ত-বন্দনার। সূত্রান্তরে জানা যাচ্ছে, সেবার শ্রীপঞ্চমীর দিনও আম্রকুঞ্জের সভায় বসেছিল 'ফালগুনী'র গানের আসর।

এই ১৯২৩ সালের আগে রীতিমতো আসরবাঁধা বসন্ত-উদ্‌যাপনের খবর তেমন পাওয়া যায় না। আজকের 'বসন্তোৎসব' সে হিসেবে বিশ্বভারতী পর্বেরই পার্বণ। নন্দিনী-বিনা আনন্দ-উৎসব অসম্পূর্ণ বলেই কি রীতিমত উৎসব হয়ে উঠতে বিশ্বভারতী পর্বের নারীভবন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অপেক্ষা ছিল বসন্তোৎসবের? তার আগে অবশ্য আশ্রমে পরিক্রমণশীল এক রকম বসন্ত-উদ্‌যাপন ছিল। প্রাক্তনী প্রমথনাথ বিশীর 'পুরানো সেই দিনের কথা' স্মৃতি-আলেখ্যে, উৎসবরাজ দিনু ঠাকুরের নেতৃত্বে খোল-করতাল সহযোগে বসন্তের গান গাইতে গাইতে আশ্রম-পরিক্রমার উল্লেখ পাওয়া যায়। আশ্রমিকদের বাড়িতে বাড়িতে তখন আম্রপল্লবের পত্রলেখায় পৌঁছে যেত বসন্তের আমন্ত্রণলিপি। এই আমন্ত্রণ-প্রকরণের মধ্যেও ছিল একটা স্নিগ্ধ আন্তরিকতার স্পর্শ।

সেকালে এই উৎসব রচিত হত আশ্রমিকদেরই রুচিসামর্থ্যে। আশ্রমগুরু স্বয়ং সবসময় উৎসব রচনা করে দিতেন, তা নয়। বসন্তোৎসব ঠিক রবীন্দ্রনাথের একক 'রচনা' নয়। বলা যায়, তাঁর রুচিনির্মাণ-প্রকল্পের সারাৎসার আত্মস্থ করে আশ্রমিকেরাই রচনা করতেন উৎসবের। আসর শেষে আশ্রমিকেরাই যেতেন তাঁদের গুরুদেবের পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করতে। শান্তিদেব ঘোষ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ১৯৩১ সালের এমনই এক আসরে বসন্তের গানের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত নেচে ওঠেন তিনি; এবং কলাভবনের ছাত্র বনবিহারী ঘোষ। তাঁদের সেই নাচের সুখ্যাতি গিয়ে পৌঁছয় রবীন্দ্রনাথের কানে। এর কয়েক বছর পর থেকেই আম্রকুঞ্জের সকালের অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ শুরু হয় আশ্রমগুরুর। আর সেই সময় থেকেই, শান্তিদেব ঘোষের বয়ান অনুযায়ী; শান্তিনিকেতনের 'দোলের উৎসব' মাত্রান্তরিত হয়ে ফুটে ওঠে নন্দিত 'বসন্তোৎসব' হিসেবে! দোলের উৎসবকে নান্দনিক করে গড়ে তোলার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ওই সাক্ষাৎকারেই শান্তিদেব বলেছিলেন, 'আগের দোল-উৎসব যেটা হত, সেটাকে গুরুদেব আর বেশি উৎসাহ দিলেন না কারণ ওই সময় নানা রকম নোংরামি হত। নোংরামি মানে কীড় কাদা দিয়ে দিল, ছেলেরা দুষ্টুমি করে কালি দিয়ে দিল– এ রকম এলোমেলো ভাব। উনি (রবীন্দ্রনাথ) ভাবলেন, এটাকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে দিতে হবে। উনি সকালে 'বসন্তোৎসব' বলে একটা বিধিবদ্ধ উৎসব করা ঠিক করলেন। তখন থেকেই আরম্ভ হল সকালবেলার অনুষ্ঠান– তাতে গান হবে, কিছু নাচ হবে– ছেলেমেয়েরা নাচবে, গুরুদেব আবৃত্তি করবেন। তখন থেকেই 'ওরে গৃহবাসী' গানটার সঙ্গে নানা রকম অর্ঘ্য নিয়ে মেয়েরা আসত।'

১৯৩৪ সাল থেকে 'নবীন' নাটকের জন্য লেখা ওই গানের সঙ্গে শোভাযাত্রায় জুড়ে গেল নাচ। সেই নাচের সংযুক্তি ছিল শান্তিদেবেরই পরিকল্পিত। 'বেশি কমপ্লিকেটেড নয়, মণিপুরী একটা সিম্পল স্টেপ– ব্যস, এই শুরু হয়ে গেল নতুন একটা দিক।' শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুও হাত লাগালেন সেই নন্দন-আয়োজনে। তালপাতা দিয়ে তিনি বানিয়ে দিতে থাকলেন শোভাযাত্রিকদের হাতের ডালি। তার কোনওটিতে থাকত ফুল, কোনওটিতে আবির। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা যত বাড়তে থাকল, নাচের দলেও এল নানা বৈচিত্র্য। যুক্ত হল কাঠির নাচ, মন্দিরার নাচ, হাতের তালির নাচ। যে উৎস থেকেই বেয়ে আসুক সে-সব নাচের ধারা; শেষ বিচারে তার উপর চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে রইল শান্তিনিকেতনের নান্দনিক রুচির নিজস্ব স্বাক্ষর।

সে একটা সময় ছিল, যখন উৎসবের নামে রুচির সামান্য স্খলনেও পীড়িত বোধ করত আশ্রম। তরুণ পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, ১৯৩৮ সালের উৎসবের দিন বৈতালিকের সময় ছাত্রাবাসের ছাদের উপর কিছু ছাত্র 'অসংযত আমোদে হৈ হৈ' করতে থাকে। এই সামান্য 'হৈ হৈ' গভীর মনঃপীড়ার কারণ হয় ওই তরুণ আশ্রম-শিক্ষার্থীর। কারণ আশ্রমের এক রকম উপলব্ধি ছিল, তাঁদের গুরুদেবের অভিধানে 'উন্মাদনা' শব্দটির কোনও স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথের বসন্ত-ভাবনায় উল্লাস-উন্মাদনা নেই, আছে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সংযম-সুন্দর আকুলতা। জগতের দিকে ব্যাকুলভাবে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গির সঙ্গে, জগতকে সবটুকু আপন করে না পাওয়ার সূক্ষ্ম একটা বেদনাবোধও জড়িয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথের বসন্ত-ভাবনায়! 'নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে'-র মত গানের চাবি দিয়ে খুলতে হয় রবীন্দ্রনাথের বসন্তের ওই আর এক অনুভববেদ্য অন্তর্প্রদেশ। এ জন্যই কবির প্রয়াণোত্তরপর্বে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন একবার বলেছিলেন, কবি নিতান্ত আমোদ-প্রমোদের জন্য এই উৎসবের সূচনা করেননি। 'এই উৎসব যা মিথ্যা ও কুৎসিত তার উপরে সত্য ও সুন্দরের জয়ের প্রতীক।'

রবীন্দ্রনাথ বা ক্ষিতিমোহনের কথা স্মরণে রাখেনি বাঙালি অত্যুৎসাহী জনতার গরিষ্ঠ ভাগ! সেই জনপিণ্ডের অশোভন সংক্রাম থেকে রক্ষা করতে ১৯৮২ সালে 'বসন্তোৎসব' স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তৎকালীন উপাচার্য অম্লান দত্ত। আমরা জানি, এই উৎসবের মধ্যে রয়ে গেছে বিভেদ-ক্ষতের অনুপম এক বিশল্যকরণী। বহিরঙ্গে নয়, মর্মকে অনুরঞ্জিত করা এই বসন্তোৎসবে 'ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো' উচ্চারণের এমন শিল্পিত উত্তরাধিকার ক'টা জাতির ভাগ্যে জোটে; মানবতার দারুণতর দুঃসময়ে?

পরমা সাংস্কৃতিক কর্মী

উন্নয়ন

বন্দে ভারত ট্রেন

ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণ

উন্নত পরিকাঠামোর ফলে একটি দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে, দেশের উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পায়, জনসাধারণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশে নতুন নৌপথ এবং নতুন অঞ্চলে সামুদ্রিক বন্দরগুলোকে বিমান পথে সংযুক্ত করার কাজ দ্রুত গতিতে চলছে এবং নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় রেলওয়ের আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়েছে। সময় বাঁচানোর পাশাপাশি সহজ পরিবহন ব্যবস্থা কাজের সুযোগও তৈরি করছে। এই সব বিষয় বিচার করে ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রাচীর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন যে, রেলের উন্নয়নের গতিকে আরও বৃদ্ধি করতে ৭৫টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করা হবে, যা দেশের প্রতিটি কোণকে সংযুক্ত করবে।

২০১৪ সালের পরে ভারতীয় রেলওয়ের গতি, ক্ষমতা ও নেটওয়ার্ককে মজবুত করার লক্ষে নানা সংস্কার সাধন করা হয়েছে, একাধিক কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন যে, 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর ৭৫তম সপ্তাহ উপলক্ষে ২০২৩ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যে ৭৫টি বলে ভারত ট্রেন চালানো হবে। দুটি বিদ্যমান বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গেই এই ট্রেনগুলো চলবে। প্রথম ট্রেনটি বারাণসী-দিল্লি রুটের জন্য এবং দ্বিতীয়টি কাটরা-দিল্লি রুটের জন্য চালু করা হয়েছিল। এখন ভারতীয় রেল হাওড়া-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালানোর পরিকল্পনা করছে এবং রেলওয়ে বোর্ড এই রুটের অনুমোদন দিয়েছে। এটি হবে তৃতীয় বন্দে ভারত ট্রেন যা হাওড়ার (কলকাতা) সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিকে যুক্ত করবে।

বন্দে ভারত ট্রেনের বৈশিষ্ট্য

- এটি প্রথম দেশীয় সেমি হাই-স্পিড ট্রেন। সম্প্রতি ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ভারতীয় রেলওয়ে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মডেল প্রদর্শন করেছে, যা তার প্রগতিশীল যাত্রাকে তুলে ধরেছে।
- এটি ভারতের সবচেয়ে আধুনিক ট্রেন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ইউরোপীয় কায়দায় ট্রেনগুলো তৈরি হয়েছে। রেল মন্ত্রকের ট্রেনের অফিস প্রাঙ্গণে এই ট্রেনের একটি রেপ্লিকাও রাখা হয়েছে।
- বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর ব্রেকিং সিস্টেম। কারণ এটি দ্রুত এবং কম গতির উভয়ের জন্যই অনুমতি দেয়। এই ট্রেনে অত্যাধুনিক বিনোদনের পাশাপাশি ওয়াইফাইয়ের সুবিধাও পাওয়া যাবে।
- এগুলো চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি, রায়বরেলির মডার্ন কোচ ফ্যাক্টরি এবং কাপুরথালার রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা হবে।
- বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটিগুলোতে স্বয়ংক্রিয় প্রবেশ, একটি মিনি প্যান্ট্রি, মডুলার বায়ো-ভ্যাকুয়াম শৌচাগার, সম্পূর্ণ সিল করা গ্যাংওয়ে এবং ধুলোমুক্ত পরিবেশের জন্য সেন্সরযুক্ত আন্তঃসংযোগ দরজার ব্যবস্থা থাকবে।
- ট্রেনে 'ফায়ার সার্ভাইভাল ক্যাবল ইনডোর' সার্কিটও পাওয়া যাবে। উন্নত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও থাকবে। প্রতিটি কোচে চারটি 'ডিজাস্টার লাইট' থাকবে। এছাড়া, জরুরি পুশবাটনের সংখ্যাও বাড়ানো হবে।

কলকাতায় চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস

কোভিড চলাকালীন সারাদেশের নাগরিকদের মানসম্পন্ন এবং সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সরকার একটি নকশা প্রস্তুত করে। এখন সরকার ধীরে ধীরে দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বনির্ভর স্বাস্থ্যকর ভারত গঠনের অংশ হিসেবে উত্তরপ্রদেশে নয়টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ, উত্তরাখণ্ডে মেডিক্যাল কলেজ এবং গোরক্ষপুরে এমস চালু করার পর সরকার এখন পশ্চিমবঙ্গে ক্যান্সার চিকিৎসার শক্তিশালী পরিকাঠামো গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৭ জানুয়ারি ২০২২ কলকাতায় চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করেছেন।

- চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে প্রচুর রোগীর ভিড় হত। স্বাভাবিকভাবেই হাসপাতাল সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দ্বিতীয় ক্যাম্পাস সেই লক্ষ্য পূরণ করবে।
- এই ক্যাম্পাসটি ৫৩০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে ৪০০ কোটি টাকা, বাকি অংশ দিয়েছে রাজ্য সরকার।
- ৪৬০ শয্যাবিশিষ্ট ক্যান্সার কেন্দ্রে ক্যান্সার নির্ণয়, পর্যায় নির্ধারণ, চিকিৎসা ও সেবার অত্যাধুনিক পরিকাঠামো থাকবে।
- এখানে নিউক্লিয়ার মেডিসিন (পিইটি), ৩.০ টেসলা এমআরআই, ১২৮ স্লাইস সিটি স্ক্যানার, রেডিওনিউক্লাইড থেরাপি ইউনিট, এন্ডোস্কোপি স্যুট, আধুনিক ব্রাকিথেরাপি ইউনিট ও অন্যান্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে।
- ক্যাম্পাসটি একটি উন্নত ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করবে, পাশাপাশি সারা দেশের, বিশেষ করে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্যান্সার রোগীদের ব্যাপক যত্ন প্রদান করবে।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সে ক্যান্সার ইনস্টিটিউট উদ্বোধনকালে বলেন, 'ক্যান্সার এমন একটি রোগ যার নাম শুনলেই দরিদ্র ও মধ্যবিত্তরা দিশা হারিয়ে ফেলেন। দরিদ্ররা যাতে সহজে এ রোগের চিকিৎসা করাতে পারেন, সে জন্য চিকিৎসা আরও সাশ্রয়ী এবং সুগম করে তোলা হচ্ছে।' • সূত্র নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

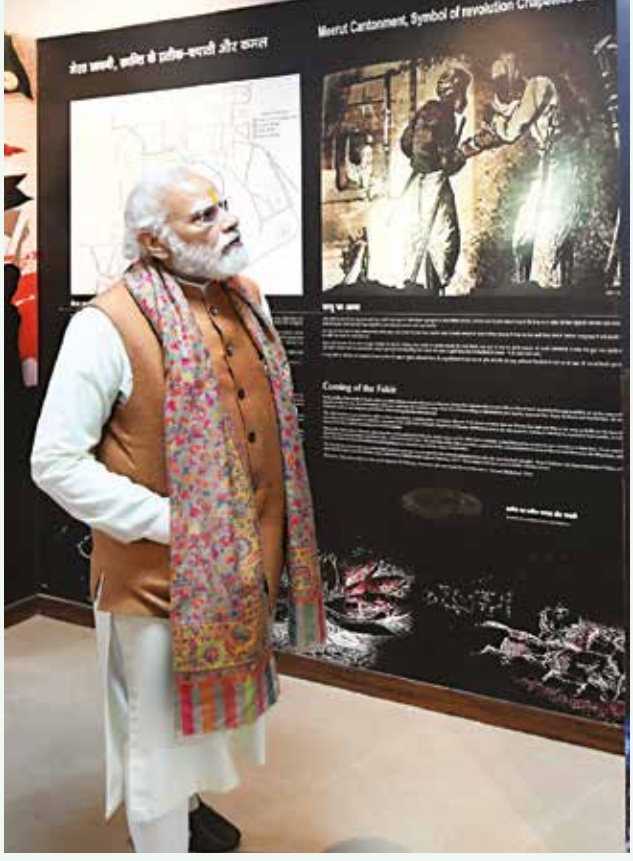

মিরাট হয়ে উঠছে উত্তর ভারতের ক্রীড়া কেন্দ্র

বিখ্যাত বিপ্লবী মঙ্গল পাণ্ডের জন্মস্থান মিরাট ক্রীড়া জগতেও সুপরিচিত। এই রাজ্যে তৈরি ক্রীড়া সামগ্রী, বিশেষ করে ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম সারা বিশ্বে রপ্তানি করা হয়। মিরাট উত্তর ভারতের নতুন ক্রীড়া রাজধানী হতে চলেছে। মিরাটের সারনায় ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মেজর ধ্যানচাঁদ স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি নির্মিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন বছরের শুরুতে ২ জানুয়ারি এই ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

আমাদের দেশের তরুণ ক্রীড়াবিদরা প্রতিভার অধিকারী এবং সাফল্য অর্জনের জন্য তাঁদের পরিশ্রমেরও অন্ত ছিল না। তবে সরকারের উদাসীনতার কারণে আমাদের তরুণদের প্রতিভা যথাযথভাবে বিকশিত হয়নি। হকি এর একটি বড় উদাহরণ। হকিতে সোনার জন্য আমাদের কয়েক দশক অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যেখানে মেজর ধ্যানচাঁদের মত ক্রীড়া প্রতিভা আমাদের দেশে ছিল। দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নতি করতে আমাদের অনেক সময় ব্যয় হয়েছে। দেশের পূর্ববর্তী সরকারগুলো এমন একটি ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল যা নতুন প্রযুক্তি, চাহিদা ও প্রতিভার সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে পারে। ২০১৪ সালের পর, সরকার এটিকে শাসনের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য সর্বস্তরে পরিবর্তন সাধন করেছে। সম্পদ, আধুনিক সুযোগ সুবিধা, গ্লোবাল এক্সপোজার ও নির্বাচনের স্বচ্ছতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। খেলাধুলা যুবকদের ফিটনেস, কর্মসংস্থান ও কর্মজীবনের সুযোগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। অলিম্পিকের প্রস্তুতির জন্য টার্গেট অলিম্পিক পডিয়াম স্কিম (টপস) চালু করা হয়েছিল। বর্তমানে 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রচারের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি কোণ থেকে সম্ভাব্য প্রতিভা খুঁজে আনা হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার ফলে ভারতের খেলোয়াড়রা আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রশংসিত হচ্ছেন। বিশ্ব তাঁদের খেলার প্রশংসা করছে। এ বিষয়টি আমরা ২০২১ সালের অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিকেও দেখেছি। ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রীড়া সংস্কৃতি বিকাশের জন্য ইনকিউবেটর হিসেবে কাজ করে। সে কারণে, স্বাধীনতার সাত দশক পর, আমাদের সরকার ২০১৮ সালে মণিপুরের প্রথম জাতীয় ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছে।

• সূত্র নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

উত্তরপ্রদেশের প্রথম ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়

• অলিম্পিকের মত খেলাধুলাও হবে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী; স্পোর্টস ট্র্যাক ও স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে।

• অ্যাথলেটিক্সের সঙ্গে ফুটবল, জ্যাভলিন বা তীর নিক্ষেপ, ডিসকাস ইত্যাদি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

• বিশ্ববিদ্যালয় মোট ৫৪০ জন মহিলা এবং ৫৪০ জন পুরুষ খেলোয়াড়সহ ১০৮০ জন ক্রীড়াবিদকে প্রশিক্ষণ দেবে।

• ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আউটডোর স্টেডিয়াম ও একটি ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে। আউটডোর গেমসে প্রায় ৩০ হাজার মানুষের বসার ব্যবস্থা থাকবে। প্রায় পাঁচ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্টেডিয়ামগুলো ইনডোর গেমসের জন্য প্রস্তুত করা হবে।

• বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বিশ্বমানের প্রযুক্তি ও অত্যাধুনিক সুবিধা পাওয়া যাবে। রাফটিং, রোয়িং, নৌকা প্রতিযোগিতার মত খেলা গঙ্গানহরে দেওয়া হবে।

• খো-খো ও মালখাম্বের মত ঐতিহ্যবাহী খেলার পাশাপাশি শুটিং রেঞ্জ, তীর নিক্ষেপ, ভারোত্তোলন, কুস্তি, হকি, ভলিবল, ট্র্যাক-ফিল্ডের মত অলিম্পিক খেলাগুলোর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

• টার্ফ গ্রাউন্ডের সঙ্গে একটি অলিম্পিক-আকারের সুইমিং পুল ও সাইক্লিং ট্র্যাকও তৈরি করা হবে।

• প্রশাসনিক ব্লক ছাড়াও অ্যাকাডেমিক ব্লক, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, অডিটোরিয়াম, সুবিধা কেন্দ্র (ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস ও দোকান), শপিং কমপ্লেক্স, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, থানা, গেস্ট হাউস, ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবন, পুরুষদের হস্টেল, মহিলাদের হস্টেল, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার বাড়ি নির্মাণ করা হবে।

• স্পোর্টস ইউনিভার্সিটিতে মাল্টিপারপাস হল, জিমনেসিয়াম, যোগ কেন্দ্র, গার্ড রুম, বাস্কেটবল, লন টেনিস, ভলিবল, ১০০ মিটার ট্র্যাক, হকি মাঠ, ফুটবল মাঠ, অ্যাথলেটিক্স, হ্যান্ডবল কোর্ট, ৬০ মিটার শুটিং রেঞ্জ, ৯০ মিটার শুটিং রেঞ্জ, ১২৫ মিটার শুটিং রেঞ্জও থাকবে।

• প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, 'যখন আমরা নতুন কর্ম-সংস্কৃতির বিকাশ করতে চাই, তখন আমাদের তিনটি জিনিস দরকার: সাহচর্য, চিন্তাভাবনা এবং সংস্থান। খেলাধূলা দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের সংস্কৃতির অংশ ছিল। ক্রীড়া সংস্কৃতি বিকাশের জন্য খেলাধূলার সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক যথেষ্ট নয়। এ কাজে সাফল্য পেতে আমাদের নতুন কৌশল প্রয়োজন হবে। দেশে খেলাধূলার স্বার্থে আমাদের সন্তানদের খেলাধূলার প্রতি আস্থা রাখতে হবে ও খেলাধূলাকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নিতে উৎসাহিত করতে হবে। এটি আমার সংকল্প আবার স্বপ্নও।'

ছোটগল্প

শাপ

অরুণকুমার বিশ্বাস

একটি বেসরকারি সংস্থার মুখ্যগবেষক আফসার সাহেব। বয়স চল্লিশের কিছু বেশি, সম্ভ্রান্ত চেহারা। চাইলে খুব সহজেই তিনি কোন সরকারি দপ্তরের জাঁদরেল অফিসার হতে পারতেন। সেই মেধা ও প্রয়োজনীয় সংযোগ, যাকে আমরা বলি হাই কানেকশান, তা তার ছিল। কিন্তু সেসব কিছু চাননি আফসার উদ্দিন। কিছুটা অন্তর্মুখী প্রকৃতির লোকটি কথা কম বলেন, অকারণ বগল বাজানো পছন্দ করেন না। বরং এ জাতীয় মানুষ তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলেন। অর্থাৎ স্বভাবতই তিনি আড্ডাবাজ নন। বন্ধুবৎসল হবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

আফসার মনে করেন বেঁচে থাকাটা নেহাতই নিয়তি, বিলাসিতা নয়। কিছু করে খেতে হয়, তাই তিনি গবেষণার কাজে নিয়োজিত আছেন। এক্ষেত্রে মাসমাইনে বা বোনাস তাকে মোটেও প্রলুব্ধ করে না। কাজ করলে বেতন নিতে হয় তাই নেন। বস্তুত আফসার সাহেবের আর্থিক কোনও টানাপোড়েন নেই। তিনি স্বচ্ছল ও বনেদি পরিবারের সন্তান। যথেষ্ট অর্থসম্পদ রেখেই তবে তার বাবা হাফিজ উদ্দিন ইন্তেকাল করেছেন।

যদি বলি আফসার উদ্দিন অসামাজিক– খুব একটা ভুল বলা হবে না। অবশ্য এই সংসারে সবাইকে যে চাহিদামাফিক সামাজিক ও পরার্থপর হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। মানুষ বরং প্রকৃতিগতভাবেই স্বার্থপর। অন্যের সঙ্গে ঠিক ততটা ঘনিষ্ঠ হয়, যতটা হলে আখেরে তার সুবিধে হয়।

আফসার সাহেব এতদিন একাই ছিলেন– এবং তাতে তার এমন কিছু সমস্যাও ছিল না। তবে কাছে দূরের টুকটাক তার যা কিছু আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন তাদের চাপেই শেষমেশ তাকে একজনের পাণিগ্রহণ করতে হয়। সম্প্রতি শায়লা নামে এক বিচক্ষণ মেয়েকে বিয়ে করেছেন আফসার উদ্দিন। আর সেখানেই সমস্যার শুরু– কারণ তার ধারণা, শায়লা এসে তার কৌমার্য হরণ করেছে। একাকীত্ব ঘোচানোর নাম করে তার ব্যক্তিজীবনে অহেতুক শুলুক-সন্ধান শুরু করেছে। সময়টা এখন বড্ড দুর্বহ মনে হয় গবেষক আফসারের কাছে।

অবশ্য শুলুক-সন্ধান মানে এই নয় যে, ত্রিশোর্ধ্ব শায়লা খুব বেশি প্রশ্ন করে আফসারকে। বরং এক্ষেত্রে উল্টোটা হয়েছে। এত কম কথা বলে বলেই হয়তো শায়লাকে আফসার রীতিমতো সমীহ করে চলে। কথা কম বললেও চোখের চাহনি দিয়ে ওটুকু পুষিয়ে নেয়। চোখ তো নয়, যেন অনুবীক্ষণ যন্ত্র।

গৌরচন্দ্রিকা অনেক হল– এবার মোদ্দা কথায় আসি। আফসারের বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। কৌমার্য বিসর্জন দিয়েছে বটে, বিনিময়ে পেয়েছে সে সামান্যই। সত্যি বলতে, বাসর রাতে ওসব অঘটন কিছু ঘটেইনি। বেডরুমের ভেজানো দরজার দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়িয়ে শায়লা সন্দিগ্ধ চোখে আফসারকে কিছুক্ষণ দেখেছে। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলেনি। আফসার দিনভর অকারণ টেনশনে ক্লান্ত ছিল। তাছাড়া নারীলোলুপ হিসেবে তার তেমন কুখ্যাতিও নেই। সব মিলিয়ে মোটামুটি পানসে কেটেছে আফসার-শায়লার বিয়ের প্রথম রাত। একটুও বিস্রস্ত হয়নি শায়লার কামগন্ধা কাঁচুলি, এলোমেলো হয়নি গভীর কেশরাশি। বরং যথেষ্ট নিটোল ও নিভাঁজ ছিল তাদের বাসরশয্যা।

বউয়ের সাথে তার বোঝাপড়া হয়নি। এক ছাদের নীচে দুজন ভিনগ্রহের মানুষ ঘোরাফেরা করে। কেউ কারো মনের খবর রাখে না– দেহেরও না। এক সময় হাঁপিয়ে ওঠে আফসার। কেমন এক বিজাতীয় ভয় দখল নেয় আফসারের বুকে।

শায়লা বেকার নয়। সে নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। স্বামীর অর্থবিত্তের জৌলুশে কোন রুচিশীল মেয়ে নিজেকে হারাতে পারে না। শায়লা একটা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ায়। তার ধারণা, স্বনির্ভরতা বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।

শায়লা বাকপটু নয়, তবে রান্নার হাত ভাল। নুন-মশলার সূক্ষ্ম হিসেব-নিকেশ ভাল বোঝে। তবে যার জন্য আয়োজন, সেই আফসার খাবারটেবিলে বড়ই ব্যস্ত থাকেন। এমনও হতে পারে, শায়লাকে তিনি

একদম বরদাস্ত করতে পারেন না। অথবা তার নিজেরই কোনও খামতি আছে, যার কারণে স্ত্রীর মুখোমুখি হতে তিনি ভয় পান।

কী সেই খামতি? কিসের এত ভয় আফসারের?

সেদিন হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় আফসার উদ্দিনের। অভ্যেসবশে টিপয়ের উপর রাখা টেবল ল্যাম্পের সুইচ অন করেন। রাতে ঘুম ভাঙলে বড্ড তেষ্টা পায় আফসারের। জগে পানি রাখা থাকে। তিনি ঢকঢক করে পানি খান। গলাটা ভিজিয়ে নেন।

সেদিনও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মাথার কাছে আলো জ্বাললেন। পোরসিলিনের জগ থেকে পানি ঢেলে খেলেন আফসার। কিন্তু শায়লা কোথায়! বিছানায় নেই। গেল কোথায়! ওয়াশরুমে? হতেই পারে।

টেবল ল্যাম্প নিবিয়ে দেন আফসার। ঘুমানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে সহজে নিদ্রাদেবী সদয় হন না। অবশ্য বয়স চল্লিশ পেরোলে শারীরিক কিছু অনিয়ম দেখা দেয়। অপর্যাপ্ত ঘুম তার অন্যতম। চোখ বুজে থাকেন আফসার। অপেক্ষা করেন শায়লার ফিরে আসার।

আরও একটি কারণে তার এই জেগে থাকা। কী অশ্চর্য! অনেকদিন বাদে তার শরীর কেমন যেন সাড়া দিচ্ছে। নিজের ভেতরে একরকম কামস্পৃহা অনুভব করেন আফসার উদ্দিন। নিজেকে প্রস্তুত করেন তিনি। কিন্তু শায়লা এখনও আসছে না কেন!

এক সময় অধৈর্য হয়ে পড়েন গবেষক আফসার। বিছানা থেকে উঠে গিয়ে ওয়াশরুমের দরজায় দাঁড়ান। নাহ, শায়লা ভেতরে নেই। আলো জ্বলছে না। অতি লাজুক প্রকৃতির মেয়ে শায়লা। তবে কি সে ওয়াশরুমও অন্ধকার করে রাখে, নিজেকে যাতে দেখতে না হয়! অ্যাবসার্ড!

একি! ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে একাকী কাঁদছে শায়লা! কিন্তু কেন, কিসের এত দুঃখ ওর! তিনি এগিয়ে যাবেন! কী করা উচিত ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না আফসার উদ্দিন। কাছে গিয়ে বুকে টেনে নেবেন– তারপর সযত্নে চোখ মুছিয়ে দেবেন শায়লার! নাহ্ বড্ড নাটুকে আর প্যানপেনে মনে হয়। আদতে এমন ধারা রোম্যান্টিক ও সুসংবেদী মানুষ তো তিনি নন।

অগত্যা চোরের মত চুপিচুপি বিছনায় এসে মটকা মেরে পড়ে থাকেন আফসার। বৈরী পারিপার্শ্বিকতার কারণে কামভাব তিরোহিত হয়। এবং এক সময় তিনি ঘুমিয়েও পড়েন।

পরদিন অফিসে গিয়ে মোটেও সুস্থির হতে পারেননি আফসার। কাজে মন বসছে না। একটা জরুরি আপডেট দেবার আছে। অথচ তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে রাতের ঘটনা। বলা হয়নি, আফসার যে অফিসে কাজ করেন, ওটা মূলত একটি ফরেন-ফান্ডেড রিসার্স সেন্টার- মনস্তাত্বিক ক্রাইসিস নিয়ে কাজ করে। তবে আফসার নিজে মনোবিজ্ঞানের এক্সপার্ট নন। তিনি অন্যদিক দেখেন।

এই প্রথম আফসার ভাবলেন, মানুষ আসলে দ্বীপ নয়। আর তিনিও রবিনসন ক্রুসো নন। শায়লার ব্যাপারটা তাকে বড্ড ভাবাচ্ছে। কারো সাথে শেয়ার করা দরকার। যাকে অন্তত বিশ্বাস করা যায়।

ইয়েস, ফায়েজ আলম। আফসারের কলিগ। ফায়েজ মানুষ ভাল। মনোবিজ্ঞানের ছাত্র। সদয় ও বন্ধুবৎসল হিসেবে তিনি সুবিদিত। তারা দুজন একই লেভেলের অফিসার তাই কারো ঘরে যেতে কাউকে পারমিশান নিতে হয় না। হঠাৎ আফসার সাহেবকে নিজের রুমে আবিষ্কার করে যারপরনাই চমকে যান ফায়েজ। আবিষ্কার বললাম এই জন্য যে, গত পাঁচবছরে এই চিড়িয়াটিকে কেউ কারো রুমে যেতে দেখেনি। নেহাত প্রয়োজন পড়লে অন্যরা যান আফসারের রুমে।

ফায়েজ নিবিষ্ট মনে কাজ করছেন। গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অযথা বাগাড়ম্বর চলে না। অর্থপূর্ণ গলা খাঁকারি শুনে চোখ তুলে দেখেন– আফসার উদ্দিন।

আরে, আফসার ভাই যে! সূর্য আজ কোন্ গগনে উঠল? বসুন বসুন, বসতে আজ্ঞা হোক। স্বভাবসুলভ অন্তরঙ্গ সুরে হৈহৈ করে উঠলেন ফায়েজ আলম।

আফসার তারল্যে যোগ না দিয়ে মাপা স্বরে বললেন, একটু দরকার ছিল।

অমনি সজাগ হন ফায়েজ আলম। সে আর বলতে, চরম কোনও বিপর্যয় না ঘটলে তার ঘরে এই লোকটির আগমন! সোজা ইউটার্ন নিয়ে স্বরে হাজার কিলোওয়াট গাম্ভীর্য ঢেলে ফায়েজ শুধোলেন, খুব আরজেন্ট? মানে হাতের কাজটা সেরে...!

ইয়েস, ইট ইজ। আফসার বললেন। কিন্তু তার আগে একটা প্রশ্ন–।

ওকে, করুন। কফি দিতে বলি? ফায়েজ সোজাসুজি আফসারের চোখে চোখ রাখেন।

নো, থ্যাঙ্কস। ব্যাপারটা সত্যি গুরুতর।

প্রশ্নটা করুন আফসার ভাই। আপনি আমাকে বন্ধু ভাবতে পারেন। অফিসে আপনাকে নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে। আমি বলি না। কারণ দুনিয়ার সবাই আমার মত হবে এটা ভাবার যৌক্তিক কোনও কারণ নেই।

গুড এবং আবারও ধন্যবাদ ফায়েজ ভাই। আমি কি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি?

নিঃসন্দেহে। তবে খুব বেশি পারসোনাল হলে আরেকটু ভেবে দেখুন শেয়ার করবেন কি না! ফায়েজের সুরে বাড়তি সিরিয়াসনেস।

বারদুই ঢোক গিললেন আফসার উদ্দিন। একটু সময় নিয়ে তারপর বললেন, ব্যাপারটা আমার স্ত্রীকে নিয়ে।

এবার বিচলিত বোধ করেন ফায়েজ। স্বামী-স্ত্রীর বিষয়ে তিনি ইন্টেরেস্টেড নন। ঘরোয়া ব্যাপার ঘরে বসে সামলানো উত্তম। বাইরে এলে সংকট কমে না, বরং জটিলতা তৈরি হয়। কিন্তু আফসার নাছোড়বান্দা। ফায়েজকে তিনি বলবেনই। পুরো অফিসে এই একজনকে তিনি ট্রাস্ট করতে পারছেন।

বলুন তাহলে, আমি কথা দিচ্ছি আর কেউ জানবে না। সম্ভব হলে আমি যেটুকু পারি হেল্প করব।

পুনরায় গলা খাঁকারি এবং দুম করে কথাটা যেন ছিটকে বেরুল আফসারের মুখ থেকে। আমার স্ত্রী শায়লা রাত জেগে কাঁদে।

সে কি, কেন?

জানি না।

প্রতিরাতেই?

জানি না। তবে দু'এক রাত দেখেছি।

ফায়েজ আর আগে বাড়লেন না। পরে কথা হবে বলে উঠে পড়লেন। তার এক আত্মীয় হাসপাতালে ভর্তি। দেখতে যাবেন। গবেষণা করেন বলে তো সমাজধর্ম সব শিকায় তুললে হবে না। লোকে মন্দ বলবে যে!

পরদিন লাঞ্চের পরে ফায়েজ নিজে থেকে আফসারের রুমে গেলেন। ভ্যানতারায় না গিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করেন, আপনি কি ভাবিকে টরচার করেন? ফায়েজের অনুমান, এ জাতীয় গোমড়ামুখো ইনট্রোভার্ট লোকেরা রন্ধনশিল্পের মত রমণশিল্পের ছলাকলারও ধার ধারেন না। সাদরে চুমু খেতে গিয়ে হয়তো আবেগের আতিশয্য হেতু সপাটে কামড় দিয়ে বসেন।

সহকর্মীর কথা শুনে বোধহয় আহত হন আফসার। মিনেমিনে গলায় বলেন, আসলে ওটি করি না বলেই হয়তো সে কাঁদে।

অদ্ভুত যুক্তি! মনে মনে হাসলেন ফায়েজ আলম। আদরে বাঁদর তৈরি হয় শুনেছি। তাই বলে অনাদরে ক্রন্দন! বাপের জন্মে শুনিনি। তাহলে এক কাজ করুন আফসার ভাই– আজ রাতে ওকাজটি করুন। ভাবির বুকের খুব কাছে মুখ ডুবিয়ে জানতে চান, রাত জেগে সে কেন কাঁদে। উত্তর পেয়ে গেলে ভাল, নইলে বুঝবেন ভেতরে প্যাঁচ আছে। সমস্যার আরও গভীরে যেতে হবে।

বলতে নেই, সহকর্মীর উপদেশ বিলক্ষণ পালন করেছেন আফসার উদ্দিন। তাতে কাজের কিছু হয়নি, বরং হিতে বিপরীত। বিশেষ মুহূর্তে শায়লা গোখরোর মত ফোঁস করেছে, ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। গবেষক স্বামীকে যেন বোঝাতে চেয়েছে, তোমার কাজ ফরমায়েশি কলম পেষা। ভালবাসার মত মামুলি ব্যাপার তোমাকে মানায় না।

ছি! অপমান। সামান্য একটি স্কুলটিচার তাকে এভাবে হটিয়ে দিল! আফসারের কী নেই, শায়লা যা একজন পুরুষের কাছে প্রত্যাশা করতে পারে। মাথার ভেতরটা তার ঝিমঝিম করতে থাকে। রাগে অপমানে তাড়িত হয় আফসার। ঢকঢক করে পুরো একজগ পানি খেয়ে নেয়। নারীর চাহিদার কাছে কি সে এতই আনাড়ি!

পরদিন অফিসে আফসারকে অচেনা লাগে ফায়েজের। লাল চোখ, অবিন্যস্ত চুল। দেখে বেশ বোঝা যায় ফায়েজের কথামতো কাজ করতে গিয়ে সে কুপোকাত। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে সে-কথা বলেও দিয়েছে।

তাহলে এবার উপায়? শায়লা কাল রাতেও কেঁদেছে। বোবাকান্না নয়, রীতিমত ফুঁপিয়ে।

বেচারা আফসার! একটু অমিশুক বটে, তবে লোক সে মন্দ নয়। তার কষ্টটা ফায়েজকে আলোড়িত করে। মানুষের মনোজগৎ নিয়ে তার কাজ-কারবার।

ফায়েজ বললেন, আমি তোমার স্ত্রীকে একবার মিট করতে পারি, যদি কিছু মনে না করো।

কোথায়?

ভাল হয় তোমার বাসায় মিট করতে পারলে। তুমিও থাকবে। তবে সে যেন বুঝতে না পারে। বুঝতেই পারছ, তোমার উপস্থিতি তাকে স্বাভাবিক হতে দেবে না। আই নিড টু মিট হার অ্যালোন।

ঘাড় নেড়ে সায় দেন আফসার। এবং সেদিনই সন্ধ্যায় ফায়েজ পৌঁছে যান বিপন্ন সহকর্মীর বাড়িতে। বাড়িটা ওদেরই। আফসারের বাবা হাফিজ উদ্দিন বিয়ের যৌতুক হিসেবে পেয়েছিলেন। কথা ছিল ফায়েজ আগে যাবে, তারপর পরিস্থিতি বুঝে আফসার ঢুকবে তার বাড়িতে। আফসারের কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। ঢুকতে অসুবিধা হবার কথা নয়। ফায়েজ শুধু কথার ফাঁকফোকরে ব্যস্ত রাখবেন শায়লাকে।

কলবেল টিপলে শায়লা এসে দরজা খোলে। সবিস্তারে নিজের পরিচয় দেন ফায়েজ। আফসারের বন্ধু, একই অফিসে কাজ করেন। কেন গিয়েছেন তার কৈফিয়ত হিসেবে মামুলি গোছের কিছু একটা বলেন ফায়েজ। কিন্তু শায়লা তাতে মোটেও সন্তুষ্ট নয়। বরং সন্দিগ্ধ সুরে জানতে চায়, এনি আইডি প্রুফ? মানে যা দেখে আপনাকে আফসারের ফ্রেন্ড হিসেবে লোকেট করতে পারি!

ও ইয়েস। দিস ইজ মাই অফিশল আই-কার্ড। ইন ফ্যাক্ট, আমরা মুখোমুখি ডেস্কে বসে কাজ করি।

শায়লা সম্ভবত ফায়েজের বাচালতায় বিরক্ত হয়। মনে মনে বলে, এত কিছু কে জানতে চেয়েছে ইউ ব্লাডি ফুল! বেটার ইউ টক টু দ্য পয়েন্ট। মনের ভাব গোপন করে অফুরান নির্লিপ্তি নিয়ে আইডিকার্ড নেড়েচেড়ে দেখে শায়লা। তারপর বলে, প্লিজ ভেতরে আসুন। ও কিন্তু নেই। আই মিন আফসার, আমার স্বামী।

আমি জানি। তবে এসে পড়বে এক্ষুণি। বেকুবের মত বলে বসলেন ফায়েজ।

আপনি জানেন! কিভাবে? নাকি সে-ই আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে!

পরিস্থিতি সামাল দিতে বোকার মতো একটু হাসেন ফায়েজ আলম। তারপর নিজে একজন মনোবিজ্ঞানী এই বিষয়টি জানান দিয়ে বলেন, একটি বিষয়ে আলাপ করতে চাই। খুব বেশি সময় নেব না। এই ধরুন মিনিট কুড়ি!

ওকে, ক্যারি অন। আই'ম প্রিটি শিওর আপনি আফসারের গুপ্তচর হিসেবে এখানে এসেছেন। নো প্রবলেম, আপনি প্রশ্ন করুন। আমি জবাব দিচ্ছি। সত্যি বলতে, আমিও একটা মাধ্যম খুঁজছিলাম। কিছু কথা বলার ছিল।

গুড। আমাকে বন্ধু ভাবতে পারলে শুরুতেই বলি, আফসারের সাথে আপনার ঠিক যাচ্ছে না, তাই না?

এটা আপনার প্রশ্ন, নাকি স্রেফ কমেন্টস? সহাস্যে বলে শায়লা। এই প্রথম ফায়েজের মনে হল আফসারের বউ যথেষ্ট সুশ্রী, শিক্ষিতা এবং বুদ্ধিমতী। হাসিটা অপূর্ব। কী বলা যায় একে– শুচিস্মিতা।

ফায়েজ যথেষ্ট স্মার্টলি বললেন, ধরুন দুটোই। আমার বন্ধু কিন্তু মানুষ ভাল।

সার্টিফিকেট দিচ্ছেন! তা দিন। আমি কিন্তু বলিনি আফসার খারাপ। অপছন্দ হলে কি তাকে বিয়ে করতাম!

তাহলে? সমস্যাটা আসলে কোথায় একটু বলবেন! আমার মনে হয় আমি আপনার কোনও কাজে আসতে পারি। নৈর্ব্যক্তিক টোনে ফায়েজ বললেন। যদিও তিনি এই মুহূর্তে বেশ উৎসাহী হয়ে ওঠেন। শায়লার সাহচর্য তাকে রীতিমত প্রাণিত করে।

একটু সময় নেয় শায়লা। ওর পেছন দিকে ঘরের প্রধান দরজা। একফাঁকে ইয়েল লকে চাবি ঘুরিয়ে টুক করে ভেতরে ঢুকে পড়েন আফসার। ভারি পর্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন। ফায়েজ টের পান, শায়লা নয়। কারণ সে তখন ভাবনার এক অন্যজগতে পাল তুলে দিয়েছে।

কফি এল। কফিতে সন্তর্পণে ঠোঁট ছোঁয়ান ফায়েজ। তাড়া দেন শায়লাকে– কী হল, বলুন।

তাড়া খেয়ে দুম করে বলে বসে শায়লা– ইউ মে নট বিলিভ, আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখি। রোজ।

দুঃস্বপ্ন, আই মিন নাইটমেয়ার! কবে থেকে? কখন? সহসাই উত্তেজিত হয়ে পড়েন মনোবিজ্ঞানী ফায়েজ।

বিয়ের পর এই বাড়িতে পা দেয়া অব্দি। সময়ের কথা বলছেন– অবশ্যই রাতে।

ও আই সি। বিষয়বস্তু কী একটু বলবেন? মানে যতটা বলা যায়– পীড়াপীড়ি করেন ফায়েজ। কোনওভাবে প্রকৃত সত্যিটা তাকে টেনে বের করতে হবে।

শায়লা চুপ। সারা ঘরে পিনপতন নীরবতা। ফায়েজ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করেন। প্রতিপক্ষকে তা বুঝতে দেন না। যেন তার ব্যস্ততার কিছু নেই। শায়লাকে স্পেস দিতে হবে। তাড়াহুড়োয় খোলস গুটিয়ে নিলে আর হল না। সব গুবলেট পাকিয়ে গেল।

ওদিকে পর্দার আড়ালে উৎকর্ণ হয়ে আছেন আফসার। কিছু শুনতে চান তিনি। শায়লার মুখ থেকে। আপসোস, মেয়েটা তাকে নিজেই সব বলতে পারত। তাহলে আর ঘরের কথা পাঁচকান হত না। তাও ভাল, শায়লা ওদের নিরাশ করেনি। স্বপ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলল, রক্তেভেজা একটা বালিশ– নাইলনের দড়ি– বাঁচার তীব্র আকুতি ও মধ্যবয়সী এক নারীর লাশ!

লাশ! সত্যি দেখেছেন? কে সে? আপনি তাকে চেনেন? ফায়েজ যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চান। বারবার জানতে চান শায়লা তাকে চেনে কি না। ইন এনি কেস, আগে কখনও দেখেছে কি না।

ব্যস, শায়লা অমনি মুখে কুলুপ এঁটে নিয়েছে। আর কিছু জানা গেল না। অতৃপ্ত ফায়েজ একসময় উঠে পড়েন। পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসেন আফসার। শায়লার অজান্তে।

দিনকয়েক বাদে আবারও উসখুস করেন আফসার। জানতে চান, ফায়েজ, কিছু বুঝলে?

অপেক্ষা করো বন্ধু। সবুরে মেওয়া ফলে। এখনও সময় হয়নি। ফায়েজের ঠোঁটে নির্বিকার পরিমিত হাসি।

আরও দিন দশেক কাটল। ফায়েজ হঠাৎ বললেন, তুমি আমার কাছে সত্য গোপন করেছ আফসার। পুরোটা ভেঙে বলোনি। এবার বলো আসল সত্যিটা কী?

ফায়েজের কথায় কেমন মিইয়ে যান আফসার। বুঝতে পারেন না, ঠিক কী জানতে চায় ফায়েজ। নাকি পারিবারিক কেচ্ছা গোপন রাখাই সমীচীন! তাতে আখেরে যা হয় হোক।

ফায়েজ অবশ্য লুকোছাপার ধারেকাছে গেলেন না। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে কড়া গলায় বললেন, তোমার মায়ের মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল না, তাই না আফসার! তিনি খুন হয়েছেন।

মানে? তুমি কী বলতে চাও ফায়েজ? নেহাতই বন্ধু বলে যা নয় তাই–। কথা শেষ করেন না আফসার। কী কী সব বিড়বিড় করেন। পরে অবশ্য ফায়েজের জ্বলন্ত চোখের সামনে হার মানতে বাধ্য হন। স্বগতোক্তির মত বলেন, আসলে তখন আমি এত ছোট ছিলাম যে–

এবারেও অসমাপ্তই থেকে যায় আফসারের বক্তব্য। ফায়েজ ওর চেম্বার থেকে উঠে যেতে যেতে বলেন, তুমি বাড়িটা বরং বেচে দাও আফসার। ওখানে শাপ আছে।

আপাতত এটুকুই। আফসার শুধু ভেবে পান না, ফায়েজ কি করে তার মায়ের মৃত্যুরহস্য জানল! শায়লা কি কিছু বলেছে! অসম্ভব। শায়লা তো এ-কথা জানে না। নাকি কোনও অসতর্ক মুহূর্তে তিনি নিজে থেকেই বলেছেন! আফটার অল, মানুষ তো। ইন্দ্রিয়ের উপর কতটাই বা নিয়ন্ত্রণ থাকে।

যাকে গে, বন্ধুর পরামর্শে আফসার এখন পত্রিকার অফিসে যাচ্ছেন। বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দেবেন। তারপর শায়লাকে নিয়ে অন্য কোথাও– যেমন হোক নতুন কোনও বাসাটাসা দেখবেন।

অরুণকুমার বিশ্বাস ছোটগল্পকার

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

সমাজ সংস্কারক ॥ আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর শৈশবে শিবরাত্রির উপোষ করার সময় মধ্যরাতে দেখেছিলেন শিবলিঙ্গের উপর ইঁদুর উঠে প্রসাদ খাচ্ছে। এই ঘটনা চাক্ষুষ করার পর থেকে তিনি মূর্তিপূজার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। ছেলের আচরণে পরিবর্তন দেখে বাবা তাঁর বিয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। তিনি বিষয়টি জানতে পেরে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। তিনি মাথা ন্যাড়া করে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন। ব্রহ্মচর্য গ্রহণের পর তিনি ভারত উদ্ধারদের পাশাপাশি সমাজে বিরাজমান অশুভ-অনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রথা দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮২৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গুজরাতের টাঙ্কারার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের আগে দয়ানন্দ সরস্বতীর নাম ছিল মূল শঙ্কর। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথিতে তাঁর জন্মদিন পালিত হয়। সমৃদ্ধিশালী পরিবারে জন্ম হওয়ায় তাঁর প্রথম জীবন খুব আরামে কেটেছিল। কিন্তু বোনের আকস্মিক মৃত্যুর পর, মূল শঙ্কর আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তী ২০ বছর ধরে তিনি মন্দির, উপাসনালয় এবং পবিত্র স্থান পরিদর্শনের জন্য সারা দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি তাঁর দ্বিধাদ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য পাহাড় ও বনে বসবাসকারী যোগীদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতেন, কিন্তু কেউই তাঁকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি। অবশেষে, তিনি মথুরায় স্বামী বীরজানন্দের সাক্ষাৎ পান। মূল শঙ্কর তাঁর শিষ্য হন। স্বামী বীরজানন্দ তাঁকে বেদের জ্ঞান আহরণের নির্দেশ দেন। তিনি জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর সব প্রশ্নের উত্তর দেন। স্বামী বীরজানন্দ মূল শঙ্করকে সমাজে বৈদিক জ্ঞান সম্প্রসারণের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তাঁর নতুন নামকরণ করেন ঋষি দয়ানন্দ।

দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৭৫ সালের ৭ এপ্রিল তৎকালীন বোম্বেতে আর্য সমাজ গঠন করেন। এটি ছিল একটি হিন্দু সংস্কার আন্দোলন। আর্য সমাজের লক্ষ্য ছিল কাল্পনিক বিশ্বাস থেকে সনাতন ধর্মকে মুক্ত করা। তিনি সর্বদা বেদের শক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। স্বামীজি কর্মসিদ্ধান্ত, পুনর্জন্ম, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসকে তাঁর দর্শনের চারটি স্তম্ভ বানিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, ১৮৭৬ সালে তিনিই প্রথম 'স্বরাজ'-এর ডাক দেন, যা পরবর্তীকালে লোকমান্য তিলক এগিয়ে নিয়ে যান। সত্যার্থ প্রকাশ লেখার সময় ভক্তি-জ্ঞানের পাশাপাশি তিনি সমাজের নৈতিক উন্নতি ও সামাজিক সংস্কারের ওপর জোর দেন। তিনি সামাজিক ভণ্ডামি, ঔদ্ধত্য, নির্মমতা ও নারীর প্রতি হিংসার বিরুদ্ধে সরব হন। তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে বিরাজমান কুসংস্কার ও ভণ্ডামির বিরোধিতা করে ধর্মের প্রকৃত রূপ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী শুধুমাত্র ধর্মীয় জাগরণের চেতনাকে প্রজ্বলিত করেননি বরং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও অবদান রেখেছিলেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের অনেক কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যতা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, নরবলি, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার করতেন। তিনি বিধবা পুনর্বিবাহ, ধর্মীয় উদারতাবাদ ও ভ্রাতৃত্বের ধারণাকে সমর্থন করেন। কথিত আছে, ১৮৮৩ সালে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী যোধপুরের মহারাজার কাছে গিয়েছিলেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজা যশবন্ত সিং দরবারের এক নর্তকীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ক্ষুব্ধ নর্তকী বাবুর্চির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দয়ানন্দ সরস্বতীর খাবারে কাচের টুকরো মিশিয়ে দিয়েছিল। ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। ১৮৮৩ সালের ৩০ অক্টোবর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যু হয়।

• সূত্র নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

আচ্ছা, বলুন তো?

উত্তর:
১.ঘ, ২. গ, ৩. গ, ৪. খ, ৫. খ, ৬. ক, ৭. ক, ৮. ঘ, ৯. গ, ১০.খ, ১১. ক, ১২. ক, ১৩. ক, ১৪. খ, ১৫.ক, ১৬. গ, ১৭. ঘ, ১৮. গ, ১৯. খ, ২০. খ, ২১.খ, ২২. গ, ২৩. ক, ২৪. ক, ২৫.ক, ২৬.খ

আপনার মতামত জানান

যোগাযোগের ঠিকানা ও ই-মেল :
ফোন: ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯
এক্সটেনশন: ১২৩৯
inf4.dhaka@mea.gov.in

কর্মযোগ

৩১ জানুয়ারি ২০২২ শহীদ দিবস স্মরণে নবকুমার রাহার নেতৃত্বে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট নোয়াখালীর কর্মীরা মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে এসএমই ফাউন্ডেশন ও ফ্যাশন ডিজাইনারস এসোসিয়েশন আয়োজিত 'ঐতিহ্যবাহী তাঁত উৎসব ২০২২' অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মণির সঙ্গে হাই কমিশনার শ্রী বিক্রম দোরাইস্বামী

৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লবকুমার দেব ও বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সী কমলপুর-কুর্মঘাট সীমান্ত হাটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

Regd. No. DA 355, Bharat Bichitra, February, 2022

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী হাসপাতাল, সাতক্ষীরার জন্য আরআইবিএ আন্তর্জাতিক পুরস্কার ২০২১ জয়ে বাংলাদেশের স্থপতি কাসেফ চৌধুরীকে অভিনন্দন